

ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী মানুষের লড়াই

মাহমী মানুষের লড়াই

আতা সরকার

সাহসী মানুষের গল্প • আতা সরকার

অ্যাডর্ন

সাহসী মানুষের গল্প



সাহসী মানুষের গল্প

ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী মানুষের লড়াই

আতা সরকার



অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

১৪১৬

সাহসী মানুষের গল্প আতা সরকার

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯

প্রথম প্রকাশ ♦ জুলাই ২০০২

প্রকাশক ♦ সৈয়দ জাকির হোসাইন ♦ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

২২ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ। ফ্যাক্স ৯৩৬২৯৪৯ ফোন ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৪৬২৯

চট্টগ্রাম অফিস ৩৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ৪০০০। ফোন : ৬১৬০১০

মুদ্রণ ♦ প্যানটোন কালার পয়েন্ট এন্ড এক্সপেরিজ, ১১/৩, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থস্বত্ব ♦ রওনক সুলতানা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ♦ সব্যসাচী মিস্ত্রী

মূল্য ♦ একশত আশি টাকা মাত্র

Shahosi Manusher Golpo ♦ Ata Sarkar

Revised and Enlarged Second Edition Published in December 2009

First Published in July 2002

Published by Syed Zakir Hussain ♦ Adorn Publication

22 Segun Bagicha, Dhaka 1000, Bangladesh Fax 9362949 Tel 9347577, 8314629

website www.adornbd.com e-mail adorn@bol-online.com

Copyright Rawnak Sultana

Cover & Illustration Sabyasachi Mistry

Price Tk. 180.00 US \$ 12 UK £ 8

ISBN 978-984-20-0073-7

AP-278-2009

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Adorn Publication.

ନିରା
ନିରା
ନିରା

সৃষ্টি

প্রসঙ্গত

ix

প্রথম পর্ব

নীল বিদ্রোহ

১১-৬৩



আত্মঘাতী কুড়োল ১৩, ঘোড়দৌড় পলায়ন ১৪, ভিটেয় ঘুমু চরেনি ১৫, বুড়ো আঙুলের ভাষা ১৭, ভাজা নীল বীজ ১৮, নীল জমি গিয়েছে ভেসে ১৯, কৃষক যোদ্ধা ও হামকল বাহিনী ২১, জেগে ওঠা গ্রাম ২৩, নিখোজ কিং সাহেবের সন্ধানে ২৫, বিপ্লবী প্রাণে আগুন জ্বলে ২৭, বিদ্রোহী বিশ্বাস ৩০, ঘোড়সওয়ার দুরন্ত তরুণ দল ৩১, গর্তের ফাঁদে ফেল্টন সাহেব ৩২, বিচারের উল্টো রায় ৩৪, দুশমন যখন মেহমান ৩৭, চিনি বিবির বীরত্ব ৩৮, বিশেষ ডাকাত ৩৯, দিপালি উৎসবের আড়াল ৪০, খাঁচার পাখি উড়াল দেয় ৪১, অশ্বখ গাছের খাঁচায় ৪২, আলোকদিয়া লড়াই ৪২, মাথার পাগড়ি কোমরে ৪৪, তিন জমিদারের জোট ৪৬, পতিত ঘোড়ার নীল গোলাম ৪৭, ময়ূরপঙ্কজী বীর ও বীরঙ্গনা ৪৯, রইস খান ৫০, সতীত্ব হরণ : জাতপাত নেই ৫১, সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ ৫৪, জুলুমের শোভাযাত্রা ৫৫, রইস খানের যুদ্ধের মহড়া ৫৬, পাগলী সখিনার অট্টহাসী ৫৭, সাহেবের কথায় কথায় টিকটিকি ৫৯, বিপ্লবীর পুনর্জন্ম ৬০, ভোরের হাওয়ায় মৃত্যুর পরোয়ানা ৬১, নারী নির্যাতনকারী সাহেব ৬২

দ্বিতীয় পর্ব

বাঁশের কেব্লা

৬৫-৮২



পোষ মানাতে বাঘের বাচ্চা ৬৭, দাড়ির খাজনায় বিড়ম্বনা ৬৭, শাহাদাতের দরজা ৬৯, চোরের সাক্ষী গাটকাটা ৭০, বিচারের বাণী নিভুতে কান্দে ৭১, মজলুম যখন এক জোট ৭২, বাঁশের কেব্লায় স্বাধীন সরকার ৭৪, নীল সাহেবের আতংক ৭৫, মুজাহিদের মৃত্যু নেই ৭৬, সাহেবের পরাজয়ের গ্লানি ৭৭, আবহমান প্রাণস্পন্দন ৮০

তৃতীয় পর্ব

শমসের গাজী

৮৩-৯৫



ভূমিদাস ৮৫, কৃষক সেনাদল ৮৭, অভিনব বিদ্রোহ ৮৯, স্বাধীন কৃষক রাজ ৯০, কুকিদের নিয়ে নতুন চাল ৯২, গাজী, না ডাকাড? ৯৪, তোপের মুখে বীরত্ব গাথা ৯৪

চতুর্থ পর্ব

বেনিয়া রবার্ট লিভসের গল্প

৯৭-১০৮



হয় শহীদ নয় গাজী ৯৯, যে আগুন ছড়িয়ে যায় ১০০, আল্লাহর দূত ১০১, বিশ বছরের ঘণা ১০২, গম চাষে স্বপ্ন ভঙ্গ ১০৪, লিভসে সাহেবের দুর্গ ১০৬

পঞ্চম পর্ব

সন্দীপের সংগ্রামী মানুষ

১০৯-১১৬



স্বপ্নদীপ সন্দীপ ১১১, আবু তোরাপের প্রতিরোধ ১১২, সন্দীপের আগুন জ্বলে অনিবার্ণ ১১৪

ষষ্ঠ পর্ব

ফকির-সন্ন্যাসীদের গল্প

১১৭-১২১



দেশপ্রেমের টানে ১১৯, 'দুশমনকে ভেতরে টেনে আন' ১২০

সপ্তম পর্ব

আরো লড়াই মানুষের গল্প

১২৩-১৩২



বাঁচা-মরার অর্থ ১২৫, কামানের তোপে বিপ্লবের জয়গান ১২৭, যোদ্ধার মৃত্যু ১২৮, জমিদার ও প্রজা এককাত্তা ১২৯, বীর পুঙ্গবদের নেপথ্য পলায়ন ১৩০

প্রসঙ্গত

বাঙালীর বীরত্ব গাথা, বিশেষ করে ব্রিটিশ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ ও মুক্তির সংগ্রাম আমাদের ইতিহাসের গৌরবময় সম্পদ। সে সময়কার অসম সাহসী বীর যোদ্ধা ও তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে আকৃষ্ট করে ও হৃদয়াবেগ প্রাণিত করে। ইতিহাসের সনিষ্ঠ পাঠে একারণেই অভিনিবেশ করতে হয়। আর তখনই ইতিহাসের পাতা খুঁড়ে বাঙালী বীর যোদ্ধারা আমাদের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠেন। আমাদের ভেতর শিহরণ সঞ্চারণ করেন; স্বপ্নকে শাণিত করেন।

সাহসী মানুষের গল্প ঠিক গল্প নয়। আমাদের ইতিহাসের নায়কদের উপস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা থেকে এগুলো লেখা— স্কেচের মত করে। সবগুলোই ইতিহাসের অন্তর্গত টুকরো টুকরো কাহিনী। কোনভাবেই কল্পনার অতিরঞ্জন নয়।

অ্যাডর্ন পাবলিকেশন সাহসী মানুষের গল্প নামে ইতোপূর্বে একটি বই প্রকাশ করেছিল। এটি তার দ্বিতীয় সংস্করণ হলেও বইটির চেহারা ও চরিত্র আমূল পাল্টে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এতে সাহসী যোদ্ধাদের আরো অনেকগুলো স্কেচ সংযোজিত হওয়ায় বইয়ের কলেবর প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এছাড়াও বিষয়ভিত্তিক কাহিনীগুলো নতুনভাবে বিন্যাসিত হয়েছে, যার পুরো কৃতি-ভার অ্যাডর্ন পাবলিকেশন-এর।

ইতিহাস-পাঠ যেমন থেমে থাকতে পারে না, ইতিহাসের আবিষ্কারও থমকে দাঁড়ায় না। এটা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। এরই সূত্র ধরে ইতিহাসের সাহসী মানুষ ও যোদ্ধাদের মুখোমুখি এখনো হচ্ছি।

প্রথম পর্ব

নীল বিদ্রোহ



আত্মঘাতী কুড়োল

পাঁচপীরতলা। চুয়াডাঙ্গার সিন্দুরিয়া আর মুর্তজাপুর গ্রামের মাঝখানের এক মশহর এলাকা। এ অঞ্চলের প্রথম ইসলাম প্রচারক পাঁচজন আউলিয়া আসেন এখানে। হযরত কুতুবউদ্দিন শাহ ও তাঁর সহচর নেয়ামত শাহর মাজার রয়েছে এ স্থানে। গ্রামবাসীদের কাছে পাঁচপীরতলার রয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা। ১৭৯৩ সাল। সিন্দুরিয়া নীলকুঠির প্রথম মালিক জেমস আইভান মে। তিনি তাঁর ম্যানেজার সি. ডব্লিউ. শেরিফ, সহকারী ম্যানেজার ও নিজের ভাইয়ের ছেলে টমাস আইজ্যাক মে, ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি ও মজুরদের নিয়ে আসেন পাঁচপীরতলায়। উদ্দেশ্য এ জায়গায় নীলকুঠি স্থাপন।

নির্ধারিত স্থানে একটা উঁচু টিবি। তার পাশে শেওড়া গাছ। সাহেব হুকুম করলেন, এই শেওড়াগাছটা কেটে ফেলতে হবে। কাঠুরে কালীচরণ সর্দার। জাতে বাগ্‌দী। বেঁকে বসল। সাহেবের মুখের উপর জবাব দিল না সাহেব, পারব না। এটা পীর আউলিয়াদের জায়গা। এখানে তোমাদের কোন অনাচার সইবে না। আমি এখানে কুড়োল ধরতে পারব না।

শেরিফ বললেন ব্যাটা বাগ্‌দী, তোর ঘাড়ে ক'টা মাথা যে সাহেবের হুকুম অমান্য করিস?

কালীচরণ গৌ ধরে রইল সাহেব, ঘাড়ের উপর আমার একটাই মাথা। ওই মাথার দরদেই আমি এখানে কুড়োল চালাতে পারব না।

তরুণ টমাস আইজ্যাক মে। ভারত জয়ের নেশা তার চোখে মুখে। তাচ্ছিল্যের সাথে বলল যতসব কুসংস্কার। এই দেখ, আমিই চালাচ্ছি কুড়োল। দেখি, তোর পীর আউলিয়ারা আমার কি করতে পারে।

বাগ্‌দীর কাছ থেকে কুড়োল কেড়ে নিল আইজ্যাক। শক্ত হাতে বাগিয়ে ধরল। তারপর শেওড়া গাছের গোড়া লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল কুড়োল।

হা-হা করে উঠল কালীচরণ সর্দার। ছুটে এসে আটকাতে চাইল আইজ্যাককে।

মুহূর্তের ঘটনা। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। সবাই কুড়োলের ধারাল ঝলক দেখতে পেয়েছিল। কেঁপে ওঠার কথা শেওড়া গাছের।

শেওড়া গাছ আগের মতই নিখর দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আইজ্যাক। তার তলপেট থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। কুড়োলটা শেওড়া গাছে না লেগে বুমেরাং হয়ে আঘাত করেছে আইজ্যাকের বাম তলপেটে।

জেমস আইভান মে নীলকুঠির স্বপ্ন বাদ দিয়ে আহত ভাইয়ের ছেলে টমাস আইজ্যাক মে-কে নিয়ে নৌকায় ওঠেন। সেখান থেকে কলকাতা। কিন্তু পথেই মারা যায় আইজ্যাক।

এর তিন বছর পর। জেমস আইভ্যান মে-র কাছ থেকে মালিকানা কিনে নেন জন রিভস। তিনিও আসেন পাঁচপীরতলার ঐ জায়গায়। কুঠি স্থাপন করতে। তবে এবার সতর্ক জন রিভস। নীলকুঠি স্থাপন করতে উঁচু টিবি আর শেওড়া গাছটি বাইরে রেখে তিনি দালানের ভিত্তি স্থাপন করেন।

তখন-তখনি কোন বিপত্তি হল না। সমস্যা দেখা গেল পরে।

সারাদিন দেয়াল আর দালান নির্মাণের কাজ চলে। পরদিন সকালে দেখা যায় সব ভেঙ্গে চুরমার। কারা যেন সব নির্মাণ সামগ্রী ছুঁড়ে দিয়েছে কাছেই নবগঙ্গার অগাধ পানিতে।

পাহারা বসান হল।

কিন্তু ঘটনার কোন হেরফের দেখা গেল না। নতুন বানান দেয়াল আর দালান ভেঙ্গেচুরে হাবুডুবু খাচ্ছে নবগঙ্গায়।

ঘোড়দৌড়ে পলায়ন

জামালপুরের নান্দিনা কুঠিতে খবর এল পক্ষীমারীর এক অশিক্ষিত চাষা কালু-চুনিয়া নীলের দাদন নিতে অস্বীকার করছে। খবর শুনেই কুঠির ম্যানেজার আর্থার ব্রুসের চোখ লাল হয়ে উঠল। এতবড় আত্মপরাধ কলেভুতো গরীব গোমূর্থ চাষার। সাহস পায় কোথেকে?

শাদা চামড়ার সাহেব আর্থার ব্রুস চেপে বসলেন ঘোড়ায়। ছুটলেন পক্ষীমারীর উদ্দেশে। সাথে আরো কয়েকজন শাদা চামড়ার কর্মচারী।

কালু চুনিয়ার বাড়ির দরজায় যমদূত প্রায় সাহেবদের ঘোড়া।

হাঁক-ডাকে কালু চুনিয়া সামনে এসে দাঁড়াল। তার বাড়ির সামনে এতগুলো সাহেব আর ঘোড়া দেখে সে ভড়কে গেল।

গর্জে উঠলেন আর্থার ব্রুস। কীরে চাষা, তুই নাকি নীল চাষের দাদন নিচ্ছিস না?

মনে মনে ঘাবড়ে গেল কালু। তবু সাহস করে বলল না সাহেব, এবারের মত আমায় মাফ করে দাও।

সাহেব বললো মাফ! মাফ কেন? নগদ পয়সা দিচ্ছি, বীজ দিচ্ছি, তোর ক্ষেত জুড়ে তুই নীল চাষ বুনে দিবি।

কালু বলল তাহলে সাহেব, তোমাকে মোদ্দা কথাটাই বলি। আমার ক্ষেতে তোমার নীল চাষ করতে আমার খরচা হয় তের টাকা হয় আনা। তুমি আমাকে দেবে চার টাকা। এই ক্ষেতে আমি যদি তামাক ফলাই, আমার খরচা হয় চব্বিশ টাকা। আর তামাক বেচে আয় হয় পঁয়ত্রিশ টাকা। আমার থাকে এগারো টাকা।

আর্থার ক্রস রেগে বললেন : আমি ঐসব ম্যাথমেটিকস আর একাউন্টিং বুঝি না । আমার চাই নীল । তোর ক্ষেত্রে নীল ছাড়া আর কিছুই হবে না ।—তামাক না, পাট না, ধান না । শুধু নীল ।

কালু চুনিয়া অনেক কষ্টে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ছিল । আর পারল না । সেও সাহেবের মত খিঁচিয়ে উঠল ক্ষেত্রে নীল বুনে কি নীল বিষ খাব? পারব না তোমার দাদন নিতে ।

সাহেবের নীল রক্তে আগুন ধরে গেল । কালু চুনিয়ার পিঠে কষে চাবুক মারল ।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কালু । মারটা আচমকাই এসেছে । মেজাজ বিগড়ে গেল । হাতের কাছেই ছিল একটা বাঁশের লাঠি । সেটাই হাতে তুলে নিল । চাবুকের জ্বালা এখনো পিঠে । সাহেব আর্থার ক্রস ভাবতেই পারেননি গোলামের জাত কালো চামড়ার নেটিভরা রুখে দাঁড়াতে পারে । কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার পিঠে পড়ল বাঁশের লাঠি । কোঁৎ করে উঠলেন সাহেব । শিরদাঁড়াটা বুঝি ভেঙ্গেই গেল । কালু চুনিয়ার তখন রণমূর্তি । চারপাশে সে শাদা চামড়া দেখছে । চক্রাকারে ঘুরছে তার লাঠি । সাহেবের দল যা খেয়ে উঃ আঃ করছে ।

তাদের ঘোড়াগুলো টের পেয়ে গেছে আরোহী মনিবদের দশা । জানবাজি রেখে ছুটে চলল নান্দিনার দিকে । ছুটছে ছুটছে । সাহেবরা তাকাচ্ছে পেছনে । কালু চুনিয়া তাড়া করে আসছে না তো?

ভিটেয় ঘুঘু চরেনি

সি. ডব্লু. শেরিফ । সিন্দুরিয়া নীলকুঠির প্রথম মালিক জেমস আইভান রে-র ম্যানেজার ছিলেন । কালক্রমে তিনিই হয়ে ওঠেন সিন্দুরিয়া নীলকুঠির মালিক । তার জমিদারীতে গোমস্তা শীতল বিশ্বাস ।

শেরিফের জমিদারীর এগারপাড়া তরফের মৌজাগুলো নড়াইলের জমিদার রামরত্ন রায়ের নিকট থেকে পত্তনমূলে বন্দোবস্ত হয় । এই এলাকার খাজনা আদায়ের তহসিল কাছারি দখলপুর গ্রামে । শেরিফ নীলকর বাড়িয়ে দিলেন দুই আনা । প্রজাদের উপর ফরমান জারি হল কবুলিয়াত দেয়ার জন্য । বেকে বসল প্রজারা । তারা পট্টাপট্টি না করে দিল ।

গোমস্তা শীতল বিশ্বাস শেরিফকে আশ্বাস দিল, আদায়ের ব্যবস্থা সে করছে ।

নীলকর আদায়ের সহজ উপায় নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন ।

জুলুমের মুখে প্রজারা গেল ক্ষেপে । তারা কাছারি লুটপাট করল । সবকিছু তছনছ করে আগুন জ্বালিয়ে দিল । শেরিফের কর্মচারীদেরকে দিল তাড়িয়ে ।

শীতল বিশ্বাস তাড়া খেয়ে দাঁতে দাঁত পিষল । মনে মনে বলল আচ্ছা, দেখাচ্ছি

মজা। এই অপমানের শোধ কড়ায়-গণ্ডায় উসূল করে নেব। থানা-পুলিশ আমাদের হাতের মুঠোয়।

হরিনাকুণ্ডু থানার দারোগা বখশ তার বন্ধু। বন্ধুর নিকট থেকে সাহায্যের আশায় সে রওনা করল থানার দিকে।

খবর পৌছে গেল প্রজাদের কাছে। শীতল বিশ্বাসকে থামাতে হবে।

শীতল বিশ্বাসের বড় ভাইয়ের জামাই আদিল বিশ্বাস। মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিল। একথা-সেকথা। কথায় কথায় সময় গড়িয়ে যায়। এই করে সন্ধ্যা নামে। এরপর ক্ষান্ত হয় আদিল বিশ্বাস। চাচা-শ্বশুরকে বিরান পথে ছেড়ে দিয়ে সে যায় ঘরে।

এরপরও রাগ-তাপ কমেনি শীতল বিশ্বাসের। গাঁয়ের মূর্থ চাষাভূষাগুলোকে এক হাত দেখে নিতেই হবে। সে পথ হাঁটতে থাকে।

সামনেই বিল। পারি দিয়ে তাহলে থানার পথ। বিলের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় শীতল বিশ্বাস। তার কান সতর্ক হয়ে উঠেছে। চারপাশে ফিসফাস শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে বিপদের গন্ধ।

সুস্থির মত কিছু ভেবে ওঠার আগেই শীতল বিশ্বাস হকচকিয়ে যায়। চারপাশে মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ কেমন করে যেন টের পেয়ে গেছে তার অশুভ অস্তিত্ব। ওরা বলল কস্তা, থানায় যাবেন না?

প্রজাদের কণ্ঠে নরম সুর পেয়ে শীতল বিশ্বাস তার আত্মায় পানি খুঁজে পায়। এখনো তাহলে সে গোমস্তা। সাথে সাথে চোখদুটো লাল হয়ে ওঠে। ধমকে কথা না বললে প্রজারা মানি-গণি করে না। সে কর্কশ গলায় বলল পথ ছাড়। আমি থানায় যাব। তোমাদেরকে উচিত মত শায়েস্তা করব।

খ্যাক-খ্যাক করে হেসে ওঠে কে যেন কাছারির আগুনের তাপ বুঝি এখনো গোমস্তা মশায়ের গায়ে লাগেনি।

আরেকজন বলে এই সাঁঝবেলায় মুণ্ডুটা যদি ধড় থেকে নামিয়ে এই বিলের মাঝখানে পুঁতে রাখি, তখন কোথায় যাবে গোমস্তাগিরি আর তর্জন-গর্জন?

আরেকজন অমনি বলে ওঠে গোমস্তা বাবাজীকে একেবারে প্রাণে মেরে ফেল না যেন। নাক-কান-গলা কেটে ছেড়ে দাও। নীল সাহেবরা ওর দশা দেখে বিলেতের জাহাজ ধরবে।

শীতল বিশ্বাসের রাগ উঠে যায় মাথায়। খঁকিয়ে ওঠে সে ইস! নাক-কান-কাটবে। একেবারে ভিটেয় ঘুষু চড়িয়ে দেব।

সড়া পড়ে যায় : প্রজাদের মধ্যে। ওরা বলে ওঠে ঘুষু তুমি বারবার চড়িয়েছ। এবার তোমায় ফাঁদ দেখাচ্ছি।

গোমস্তা শীতল বিশ্বাসের নাক কাটা গেল। কান কাটা গেল। শেষ পর্যন্ত গলাটাও। বিরান বিলে পড়ে রইল গোমস্তা শীতল বিশ্বাসের মুণ্ডু আর ধড়।

বুড়ো আঙুলের ভাষা

ঘোষবাড়ি গ্রামের কৃষক রব্বানীকে ডেকে পাঠালেন কৃষ্টিয়াল ক্রমফিল্ড ।

রব্বানী মগল সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বলল : সাহেব, তোমার সাথে আমার তো কোন কারবার নেই, তবু ডেকে পাঠিয়েছ কেন?

ক্রমফিল্ড মধুর হেসে বললেন তুমি হলে এদেশের একজন বিশিষ্ট রায়ত, তোমাকে ডাকব না তো কাকে ডাকব?

সাহেবের শয়তানি জানা আছে রব্বানী মগলের । মিষ্টি কথায় সে ভুলল না ।

সাহেবের কথার পিঠে কথা ঠেকিয়ে দিল সে বাহ! রায়তের প্রতি খুব দরদ সাহেবের!

সাহেব আন্তরিকতার ভাব দেখিয়ে বললেন : দরদ বলেই তো তোমার বোঁজ-খবর নিচ্ছি ।

রব্বানী মগল বলল ভাল কথা । আমার ভিটেমাটি ফিরিয়ে দাও । তারপর তোমার দরদটা দেখি ।

সাহেব অবাক হওয়ার ভান করে বললেন কেন? তোমার ভিটেমাটির কি হল?

রব্বানী মগল বলল ভালই যাত্রা করতে শিখেছি । তোমার হুকুমেই আজ আমি ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ ।

সাহেবের অবাক হওয়া কাটে না । বললেন : কেন? তোমাকে উচ্ছেদ করল কেন?

রব্বানী মগল তীব্র শ্রেষের সাথে বলল : ন্যাকা! যেন কিছুই জানে না । নীলচাষের একরারনামায় সই করিনি বলে তোমার লোকেরা আমার নিজের ভিটে থেকে আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে ।

ক্রমফিল্ড এবার বুঝলেন । হেসে বললেন : ওদের দোষ কোথায়? আমিই তো বলেছি, যারা নীল চাষ করবে না, তাদেরকে ভিটে-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করবে ।

রব্বানী মগল বলল : ভিটেমাটি নিলে । তাতেও তোমার শাস্তি নেই? এবার কি চাই?

ক্রমফিল্ড গম্ভীর হয়ে বললেন : তোমার বুড়ো আঙুল ।

রব্বানী মগল সাহেবের কথা ঠিক বুঝতে পারল না । জিজ্ঞেস করল : বুড়ো আঙুল কেন?

সাহেব বললেন : ঐ আঙুল দিয়ে নীল চাষের একরারনামায় টিপসই দেবে ।

রব্বানী মগল ফোঁস করে উঠল । বলল : নীল হলো আমাদের জন্য বিষ । ঐ বিষ আমাদের ক্ষেতে আর ফলাতে চাই না ।

সাহেব বললেন বিষ হবে কেন? নীল হলো পণ্য । নীল বেচে অনেক পয়সা পাওয়া যায় ।

রব্বানী বলল পয়সা তোমরা পাও, আমরা না । আমরা আমাদের ক্ষেতে ধান বুনতে চাই, পাট ফলাতে চাই ।

ক্রমফিল্ড বললেন তোমাদের ক্ষেতে ধান হবে না। পাকা ধানে মই দেব। পাট হবে না, কোমলা পাট কেটে এনে শাক বানাব।

রব্বানী মণ্ডল ক্ষেপে-টেপে বলল তাহলে তোমাদের নীল তোমরাই চষোগে। আমরা পারব না।

ক্রমফিল্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাণ্ডা গলায় বললেন : ভেবেছিলাম, তোমার বুড়ো আঙুল নীল চাষের একরারনামায় টিপসই দেবে। এখন দেখছি, ওটা কোন কাজেই আসবে না। যে আঙুল কোন কাজে আসে না, সেটা আর বয়ে বেড়ানো কেন? ওটাকে তাহলে কেটে ফেলাই ভাল।

ক্রমফিল্ডের হুকুমে দু'জন লোক এসে দু'দিক থেকে রব্বানী মণ্ডলকে চেপে ধরল। আরেকজন ছুরি দিয়ে তার বাম হাতের বুড়ো আঙুলটা ঘ্যাঁচ করে কেটে নিল। মাটি লাল হয়ে উঠল। রব্বানী মণ্ডলের হাতও। ব্যথায় চৈঁচিয়ে উঠল সে। কিন্তু পরক্ষণেই দাঁতে ঠোট চেপে চিৎকার থামাল। লোকদু'টো ছেড়ে দিল রব্বানীকে।

রব্বানী মণ্ডল উঁচিয়ে ধরল তার কর্তিত বুড়ো আঙুল।

: যতদিন বেঁচে আছি, এ আর কোন দিন নামবেনা। বুড়ো আঙুলের ভাষা কি কিছু বোঝো?

সাহেব কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই রব্বানী মণ্ডল তার সামনে এক দলা থু-থু ফেলে সেখান থেকে চলে এল।

ভাজা নীল বীজ

দুর্গাপুরের পিয়ার মণ্ডল নীল বীজ নিয়ে গেছে সেই কবে। তারপর আর কোন খোঁজ-খবর নেই। কুঠিয়াল সাহেব খবর পেলেন, পিয়ার মণ্ডলের কোন ক্ষেতেই নীল চাষ হয়নি।

পাওয়েল সাহেব তলব করলেন পিয়ার মণ্ডলকে।

পিয়ার মণ্ডল সাহেবের সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়াল। সাহেব বললেন : পিয়ার, তোমাকে ভাল মানুষ বলেই তো জানি।

পিয়ার মণ্ডল বিনয়ের অবতার। বিগলিত হয়ে বলল সাহেব, তোমরা রাজা। আমরা সামান্য প্রজা। কোন গোস্তুফি হলে মাফ করে দিও।

সাহেব বললেন হুম! তুমি কুষ্টিয়া গোলা থেকে নীলের বীজ নিয়েছ?

পিয়ার সম্মতি জানাল জেঁ আজে।

সাহেব জিজ্ঞেস করলেন : কেন নিয়েছ?

পিয়ার বলল আমাদের নিজেদের ক্ষেতে লাগানোর জন্য।

সাহেব জিজ্ঞেস করলেন লাগিয়েছ?

পিয়ার বলল আজ্ঞে না।

: কেন?

পিয়ার হাত কচলে বলল : মাফ করো সাহেব। আমার খুব সাধ ছিল জমিতে নীল চাষ করার। এ জনোই খুশি মনে তোমার গোলা থেকে নীল বীজ নিয়ে গিয়েছিলাম। হা কপাল! ধামায় রেখে দিয়েছিলাম নীল বীজ। বাড়িতে ছিলাম না। ছেলেমেয়েরা ধামার নীল বীজ দেখে ভুলে মনে করল তিল। ভেজে নাড়ু বানিয়ে খেয়েছে। বাড়ি ফিরে শুনি এই ঘটনা। আমি হায় হায় করি। আমার সাধের নীল বোনা আর হল না।

সাহেব নীরব হয়ে পিয়ার মণ্ডলের কথা শুনলেন। তিনি আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। বললেন : ঠিক আছে। এখন যাও।

পিয়ার মণ্ডল বিদায় হল। পাণ্ডয়েল সাহেব তার সাক্ষপাঙ্গদের বললেন লোকটা খুব রসিক।

গোমস্তা বলল এই রস যে কদূর গড়াচ্ছে।

পাণ্ডয়েল জিজ্ঞেস করলেন কেন?

গোমস্তা বলল রসিক পিয়ার মণ্ডলের পথ ধরে গাঁয়ের চাষাভুষোরা একজোট বেঁধেছে। ওরা নীলের বীজ খোলায় ভেজে জমিতে বুনছে। এভাবে হাজার হাজার বিঘা জমির নীল আবাদ নষ্ট করে ফেলছে।

পাণ্ডয়েল সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন পিয়ার মণ্ডলের রসিকতাতেই এই সর্বনাশা ইঙ্গিত পেয়েছি। তাই তো ওকে কিছু না বলে ছেড়ে দিলাম।

নীলের জমি গিয়েছে ভেসে

হিন্দুর পাড়ার নফর মণ্ডল। শেরিফ সাহেবের কাছ থেকে পেয়েছে নীলের বীজ। সাহেবের কড়া হুকুম জমিতে বুনতে হবে। এবার চাই নীলের বাষ্পার ফলন।

নফর মণ্ডল কি আর করে, নীলের বীজ বুনে দিল তার জমিতে। এর মধ্যে গুজব এসে পৌঁছল, নীল চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মনটা ধেই-ধেই করে নেচে উঠল নফর মণ্ডলের। কে আর সাধ করে জমিতে বিষ ঢালতে যায়! রাতে রাতে সে তার জমিতে যত নীল চাড়া হয়েছে সব তুলে ফেলল। জমি পরিষ্কার। নীল গাছ সব ফেলে দিল নর্দমায়ে।

শেরিফ সাহেবের কানে গিয়ে পৌঁছল খবর। শুনে তিনি তো রেগে-মেগে আগুন। পারলে এখুনি নফরের কল্যা কাটেন।

তলব করলেন নফর মণ্ডলকে।

খবর পেয়ে নফর গায়েব। সাহেবের মুখোমুখি সে আর হতে চায় না। নিজেকে আড়াল করে সে ঘুরে বেরায় বনে-বাদাড়ে। কিন্তু কত দিন? ঘরে টানে মন। আনচান করে ওঠে নফর মণ্ডল। এদিকে সাহেবের লোকজন হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে।

নফর বুঝল, এভাবে পালিয়ে থাকা যাবে না। সাহেবের ক্ষ্যাপা কুস্তা লোকজন এক সময় না এক সময় পাকড়াও করবে তাকে। তখন আর হেনস্তার শেষ থাকবে না।

মরিয়া হয়ে উঠল নফর। যা থাকে কপালে, সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়াবে সে। কৃষকের বুকে কেমন হিম্মত আছে তা বুঝিয়ে দেবে। নফর মণ্ডল একটা বুকি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে বন-জঙ্গল ছেড়ে ফিরে চলল তার গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। সেদিন রাতে তুমুল ঝড়বৃষ্টি। ওর মধ্যে কাক-ভেজা হয়ে মনে ভুয়ের আশ্রয় নিয়ে ঘরে ফিরল নফর।

পরদিন খুব সকাল। ঝড়-বাদল থেমে গেছে। কিন্তু তার চিত্র ছড়িয়ে আছে সবখানে। মান সেরে পবিত্র হয়ে জেগে উঠেছে প্রকৃতি। শেরিফ সাহেব মুগ্ধ হয়ে দেখছেন ভোরবেলাকার বৃষ্টি-সিক্ত প্রকৃতি। তার দোতারা দালান বাড়ি। ছাদে উঠে পায়চারি করছেন। প্রকৃতি থেকে শুমে নিচ্ছেন মুক্ত বাতাস। এ তার নিত্যদিনকার অভ্যাস।

এ সময়ই শেরিফের নজর চলে গেল নিচের দিকে। তার বাড়ির চারপাশে ঘোরাফেরা করছে কে যেন। তিনি দাঁড়ালেন। লোকটিকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

অবশেষে শনাক্ত করতে পারলেন লোকটিকে। নফর। তার বোয়াড়া রায়ত নফর মণ্ডল। এদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আজ কোন্ মতলবে যেন এদিকে ঘুর-ঘুর করছে। সাথে সাথে হেঁকে উঠলেন। দারোয়ানকে হুকুম করলেন নফরকে ধরে আনতে। দারোয়ান মুহূর্ত বিলম্ব করল না। ধরে আনল তাকে। হাজির করল সাহেবের সামনে।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল নফর মণ্ডল। ধরা গলায় দুঃখিত ভঙ্গি নিয়ে বলল : কি বলব সাহেব, আমার কপালটাই মন্দ। কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। এতে কার কি ক্ষতি হয়েছে জানি না, আমার সর্বনাশ হয়েছে। কাল সারা রাতের ঝড়বৃষ্টিতে আমার সব নীলের জমি কোথায় ভেসে চলে গিয়েছে কে জানে!

সাহেব বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন নীলের জমি ভেসে গিয়েছে?

নফর মণ্ডল বলল হ্যাঁ সাহেব। কত জায়গায় কত আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম কোথাও পেলাম না।

সাহেব মৃদু হেসে বললেন শুধুই নীল ভেসে গেল, আর কিছু যায়নি?

সাহেবের কথা শুনে খতমত খেল নফর। তবে মুহূর্তের জন্য। সপ্রতিভভাবে বলল শুধু নীল কেন! ওর সাথে আমার পাটের ক্ষেতও ভেসে গিয়েছিল, তবে সেটা বেড়াই গ্রামের মাঠে পাওয়া গিয়েছিল।

নফর মণ্ডলের চটজলদি জবান শুনে তার দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন শেরিফ সাহেব।

কৃষক যোদ্ধা ও হামকল বাহিনী

নীল মানিনে। নীল চাষও মানিনে। নীল আমাদের জন্যে বিষ। শাদা চামড়ার নীল সাহেবরা আমাদের সর্ব অঙ্গে নীলের বিষ মাখিয়ে দিতে চায়। ধানের জমি পাটের জমিতে নীলের দলা ছিটিয়ে দিতে চায়। ওসব আমরা মানিনে। এই রইলাম খাড়া, নীল সাহেবদের দেশ ছাড়া না করে মুখে আর কিছু রুচবে না।

সারা বাংলা জুড়ে নীলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সব এককাটা। জানা কথা, নীল সাহেবরা তাদেরকে এমনি-এমনি ছেড়ে দেবে না। নীলের আবাদ না হলে যে তাদের সর্বনাশ। তাহলে সাত-সমুদ্রের তের নদী পাড়ি দিয়ে এই অসভ্য বর্বরদের দেশে আসা কেন?

কিন্তু কৃষকরা একজোট। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে তাদের নীল প্রতিরোধ বাহিনী। নীল কুঠিগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে সাহেবগুলোকে দেশ ছাড়া না করলে আর শান্তি নেই।

শান্ত সুবোধ নিরীহ গোবেচারা কৃষক। নীল সাহেব আর চামচাদের জ্বালায় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। আর পড়ে পড়ে মুখ বুঁজে মার খাওয়া নয়। সহিংস ক্রোধ নিয়ে তারাও উঠে দাঁড়াল।

কৃষকদের সুসংগঠিত রূপের এমনি এক বিবরণ পাওয়া যায় নদীয়া জেলা থেকে। ১৮৬০ সালে নদীয়ার এক জার্মান পাদ্রী মাসিক পত্রিকা 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এ এক চিঠিতে এর বর্ণনা দেন।

কৃষকরা নীল সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে। এ বাহিনী তারা গড়ে তোলে পরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত কায়দায়।

কৃষক যোদ্ধারা নিজেদেরকে নানান ভাগে ভাগ করে। এভাবে সৃষ্টি করে ছ'টি কোম্পানি—রীতিমত সামরিক কায়দায়। আধুনিক অস্ত্রপাতি গোলাবারুদ তাদের নেই। তাতে কি? আছে দেশী লাঠি-সোটা দা-বল্লম। আর আছে অসীম মনোবল। প্রথম কোম্পানিতে রয়েছে তীরন্দাজরা। দ্বিতীয় কোম্পানি হল গোলা নিক্ষেপকারী, তারা ফিস্কে দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করে। তৃতীয় কোম্পানিতে রয়েছে ইটওয়ালারা। তারা নানা জায়গা থেকে ইট কুড়িয়ে এনে জড়ো করে রাখে। এগুলোই তাদের গোলাবারুদ। বেলওয়লাদের নিয়ে চতুর্থ কোম্পানি। এরা গাছ থেকে বেল পেড়ে নিয়ে আসে। নীলকর বাহিনী লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত ছুঁড়ে মারে। মাথা ফটাতে এই যথেষ্ট। পঞ্চম বাহিনীতে ছিল থালাওয়ালারা। তারা ভাত খাওয়ার কাঁসা-পিতলের থালাগুলো আনুভূমিকভাবে চালাতে থাকে। ষষ্ঠ কোম্পানির সৈনিক হলো কিষাণ মেয়েরা। এরা হল রোনঅলা। খুব ভাল করে পোড়ান খন্ড বা অখণ্ড মাটির বাসন ও পাত্র মিলে এদের অস্ত্র। যুদ্ধের সময় মেয়েরা এগুলো ব্যবহার করত। এ কোম্পানির হামলায় নীল বাহিনীর কত যে সৈনিক রক্তাক্ত হয়ে পিঠটান দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তার হিসেব নেই।

এছাড়াও ছিল লেঠেল আর বল্লমধারী নিয়ে দু'টি কোম্পানি। এরা ছিল দুর্ধর্ষ ও অসম সাহসী। এদের নাম শুনেই পিলে চমকে উঠত নীল সাহেবদের। লেঠেল বাহিনীর কৃষকদেরকে লাঠি চালানোয় খুব ভাল করে তালিম দেয়া হয়। এ জন্য দেশের নানান স্থান থেকে জাঁহাবাজ লেঠেল ওস্তাদ আনা হয়। বরিশাল, রংপুর, টাঙ্গাইল থেকে আসে ওস্তাদরা। কিষাণ ঘরের তাগড়া ছেলেরা দল বেঁধে লেঠেল বাহিনীতে যোগ দেয়। হাতে পাকানো লাঠি, এই নিয়ে তাদের গর্ব। গ্রামের লোকরাও তাদেরকে সম্মান-সমীহ করে কথা বলে। তারা যখন যুদ্ধে যায়, তখন কাড়া-নাকাড়া ঢোল-বাজনা বাজে। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বেশে তারা ঘরে ফিরে। আগ্নেয়াস্ত্র সুসজ্জিত নীল বাহিনী তাদেরকে দেখলে ঘাবড়ে যায়। তাদের সাহস আর রণকৌশলের সামনে শত্রুপক্ষ পালানোর পথ খুঁজে পায় না।

বল্লম আর কোচধারীদের নিয়ে বল্লম বাহিনী। মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে লোহার শলা দিয়ে বানানো কোচ, জুত অর বল্লম হাতে কৃষক যোদ্ধাদের দেখলে নীল বাহিনী থর-থর করে কাঁপে। এ বাহিনীর যোদ্ধারা কোচ আর জুত হাতে লুকিয়ে কোন গ্রামে হামলা করতে যাওয়ার পথে কিংবা গ্রাম লুট করে ফেরার পথে সামনে পড়লে বল্লমধারী কোচধারী জুতঅলারা এদের উপর চড়াও হয়। দু'চারজন জুতঅলার সামনে পড়ে নীলকরের শত শত লেঠেল দিশেহারা হয়ে পালায়। একজন বল্লমধারী অবলীলায় একশ' জন লেঠেলকে কুপোকাত করে দেয়। কোন নীলকুঠি আক্রমণ ও ধূলিস্মাৎ করে দেয়ার জন্যে হাজার হাজার কৃষক যোদ্ধা পলো আর ঝাঁক জাল কাঁধে আর জুত হাতে এগিয়ে যায়। এদেরকে বলা হয় পলো বাহিনী।

আর রয়েছে হামকল বাহিনী। নীলকরদের আজরাইল। তিতুমীরের অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্য এরা। বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাজ হল নীলকুঠি, অত্যাচারী জমিদারের কাছারি আর মহাজনদের গোলাবাড়িতে হামলা চালানো। এ বাহিনীর কেউ কেউ নীলকুঠির চাকুরে ছিল। তারা কুঠিবাড়ির বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজ-খবর করে। গুপ্তচরের কাজ আর কি। দরকারী খবর ও তথ্য গোপনে পাচার করে হামকল বাহিনীর কাছে। হামকলদের ভয়ে অনেক কুঠিয়াল ব্যবসা-বাণিজ্য পাততাড়ি গুটিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরতে বাধ্য হয়েছে।

নীলকরদের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য গ্রামবাসীরা নানা ফন্দি-ফিকির বের করে। প্রত্যেক গ্রামের এক প্রান্তে একটা ঢাক রাখা হয়। নীল লেঠেলদের দেখা গেলেই গ্রামবাসীদের কেউ দুম-দুম করে ঢাকে আওয়াজ তোলে। গ্রামের কৃষকদের ঘরে ঘরে সব সময়ই আয়োজন করাই থাকে। যে যেখানেই থাক, ঢাকের এই আওয়াজে সবাই সচেতন হয়ে যায়। ঘর থেকে লাঠিসোটা অস্ত্রপাতি যা আছে নিয়ে ছুটে আসে। অন্য গ্রামেও এই ঢাকের আওয়াজ গিয়ে পৌছে। চারপাশের গ্রামগুলো থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ বেরিয়ে আসে সশস্ত্র হয়ে। ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নীল বাহিনীর উপর। নীল সাহেবদের পাইক-পেয়াদারা হাত-পায়ে জখম নিয়ে রুদ্ধস্থানে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। গ্রামে গ্রামে তখনো বেজে চলে যুদ্ধের দামামা।

ভেঁগে ওঠে গ্রাম

১৮২৯। জামালপুরের এক গ্রাম।

কুঠিয়াল খবর পেল, গ্রামের লোকেরা নীল বুনতে রাজি নয়। যারা নীলের দাদন নিয়ে গিয়েছিল, কৃষকরা তাদেরকে দূর-দূর করে তড়িয়ে দিয়েছে।

গুনেই কুঠিয়াল অগ্নিশর্মা। আধন্যাংটা কালো চামড়ার কৃষকরা এত সাহস পায় কি করে? না, ওদেরকে আর বাড়তে দেয়া যায় না। এখনি এর একটা বিহিত না করলে এদেশ থেকে নীল চাষ গুটাতে হবে। নীল চাষ কি, এমন চললে ওরা আর ক'দিন বাদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনই মানবে না।

কুঠিয়াল হেঁকে উঠল কোথায় আমার লেঠেলরা? গাঁয়ের মূখ্ চাষাগুলোর গায়ে নীলের বিছা ছেড়ে দিয়ে এসো। পিটিয়ে পিটিয়ে ওদের গায়ের চামড়া নীল করে দাও। এমন করে পিটাতে যেন চোখে নীল ছাড়া আর কিছুই দেখতে না পায়।

কে একজন বলে উঠল গাঁয়ের লোক খুব বজ্জাত। এমনি-এমনি না গিয়ে এক-আধজনকে না পাঠিয়ে আয়োজন করে যাওয়াই ভাল।

সাহেব তাস্ছিলের সাথে বলল : গাঁয়ের কলে-ভূতোর কি করবে? ওদের মাতবর গোছের দু'তিনটেকে পিটিয়ে দিলেই সব ঠাণ্ডা।

লেঠেলদের সর্দার খানেক ভেবে বলল সাহেব, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবু সাবধানের মার নেই। কিছুটা প্রস্তুত হয়ে যাওয়াই ভাল।

সাহেব বলল ঠিক আছে। তাই হোক। গাঁয়ের চাষাভূষাদের মনে জনৈক মত ভয় ধরিয়ে দাও, আর যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

কুঠিবাড়িতে ধুম পড়ে গেল। লেঠেলরা সাজতে লাগল।

তারপর মার-মার কাট-কাট রবে গিয়ে পড়ল গ্রামের উপর। একেবারে পাঁচশ' জনের লেঠেল দল।

গ্রামের মানুষ আগের থেকেই ছিল হুঁশিয়ার। নীলের দাদন ফেরত পাঠিয়েছে, কুঠিয়াল সাহেব এমনি-এমনি ছেড়ে দেবে না—এ তাদের আগেই জানা। গ্রাম থেকে দূরে রাস্তার ধুলো উঠতে দেখেই তারা বুঝে নিয়েছে, ঐ অনাসৃষ্টি আসছে। এখনি সামাল দিতে না পারলে ঘরবাড়ি-সংসার সব তছনছ করে দিয়ে যাবে।

কয়েক হাজার গ্রামবাসী রুখে দাঁড়াল পাঁচশ' লেঠেলকে। গ্রামের মারমুখো মূর্তি দেখে প্রমাদ গুনল লেঠেলরা। ভাড়া খাটতে এসে শেষ পর্যন্ত কি জানটা খুঁয়াবে? বেদম পিটুনি খেয়ে কুঠির লেঠেলরা পিঠি টান দিল। কুঠিয়াল সাহেবও খুঁড়াতে খুঁড়াতে ফিরে এল নীল কুঠিতে। গায়ে জখম। সাথে সাথে অপমানের অসহ্য জ্বালা।

কুঠিয়াল খবর পাঠাল থানায়। দেয়া হল এজহার। মাতবরগুলোকে হাজতে পুরতে হবে। তারপর সাহেব দেখে নেবে ওদেরকে—কিভাবে ওরা ওদের জমিতে নীল না বুনে গ্রামে বাস করতে পারে।

থানা থেকে পুলিশ এল গ্রামে। ঘরে ঘরে টুঁ মেরে মাতবরগুলোকে খুঁজতে লাগল। তাদের তাগুবে গাঁয়ের মানুষগুলোর চোখ জুলে উঠল।

পুলিশরা মাতবরদের খুঁজে পায় না। হতভিসি করে। গাঁয়ের মানুষের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই।

ইঠাৎ করেই পুলিশরা টের পায়, তাদের চারপাশে কি যেন একটা ঘটছে। তাকিয়েই তাদের পিলে চমকে ওঠে। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল যে লোকজন, যাদেরকে দেখে মনে হয়েছিল পুলিশ দেখে খুব ভয় পেয়েছে, তারাই জোট বেঁধে সাঁড়াশির মত এগিয়ে আসছে। পুরো পুলিশের দলটিই ঘেরাও। কোন কিছু বোঝার আগেই জনতা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরপর বেদম মারপিট। কোন রকমে জান নিয়ে পালিয়ে এল পুলিশের দলটি।

পরদিন আরো পুলিশ এসে গ্রাম ঘেরাও করল। তারপর গুলি ছুঁড়তে লাগল। এবার গ্রামের লোকগুলো যাবে কোথায়?

গ্রামের কয়েকজন মাতবর এসে দাঁড়াল পুলিশ বাহিনীর সামনে। বলল এত গোলাগুলি খরচা করে ফায়দা কি? পুলিশরা গাঁয়ের মেহমান, আসুন না গাঁয়ের ভেতর। যারা অপরাধ করেছে, তাদেরকে ধরে নিয়ে যান।

পুলিশের রাগ আরো উচুতে ওঠে। ব্যাটারা এখন ভয় পেয়েছে। জঙ্গি ভাবটা নেই। এখন গাঁয়ের লোকগুলোকে পিটিয়ে সুখ। দু'একজনকে বেয়নেটে গাঁথোও তোলা যাবে। পুলিশ আরো দাপট দেখায়।

এই সময়ই বেজে ওঠে শাঁখ। দ্রিম-দ্রিম বাজে ঢাক।

গাঁয়ের সবচাইতে উঁচু গাছের মগডালে বাঁধা রয়েছে ঢাক আর শাঁখ। এখন সেগুলোই বাজছে।

পুলিশ আচমকা বাজনায়ে হতচকিত হয়ে ওঠে। ওকি! ওটা কি বাজে? প্রবীণ মাতবর বলে পুলিশ গাঁয়ের মেহমান। তাই শাঁখ বাজিয়ে ঢাক পিটিয়ে পুলিশদের বরণ করে নিচ্ছে গ্রামবাসীরা।

ঢাকের আওয়াজ পৌছে গিয়েছে আশপাশের গ্রামগুলোতে। এ বাজনার অর্থ তাদের জানা। সাথে-সাথে সাজ-সাজ পড়ে গেল। কয়েক গ্রাম থেকে হাজার হাজার কৃষক অন্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটে এল আক্রান্ত গ্রামের দিকে।

গ্রাম ঘেরাও করতে এসে সশস্ত্র পুলিশ দল নিজেরাই ঘেরাও হয়ে গেল। কোন কিছু বোঝার আগেই গ্রামবাসীরা তাদের অন্ত্রশস্ত্র হাতিয়ারপাতি কেড়ে নিল। গ্রামবাসীদের হাতে পুলিশদের নাজেহালের শেষ নেই। বেদম প্রহারে তাদের সঙ্গিন অবস্থা। এরপর আবার বেঁধে রাখা হলো গ্রামের মাঝখানে। তখনো ঢাক বাজছে। দ্রিম-দ্রিম।

নিখোঁজ কিং সাহেবের সন্ধানে

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নালিশ হল, তাঁরই স্বজাতি ভাই কিং সাহেব হারিয়ে গেছেন। দুষ্ট কৃষক-প্রজারা তাঁকে গায়েব করে দিয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। এত বড় কথা! আজ নীলকর সাহেব গায়েব হয়েছে। কাল যে তাঁকে গায়েব করা হবে না, কে বলতে পারে? ম্যাজিস্ট্রেট সেনাবাহিনীকে হুকুম করলেন কিং সাহেবকে খুঁজে বের করতে। তখন ১৮৪৩।

ময়মনসিংহের (বর্তমানে টাঙ্গাইলের) কাগমারি। এখানকার নীলকুঠির অধ্যক্ষ কিং সাহেব। তাঁর অনেক খ্যাতি। সাহেব মহলে। প্রজাদের মধ্যেও। সাহেবরা বলে, কুঠিয়াল হতে হলে এমন শক্ত লোকেরই দরকার। প্রজারা বলে, কিং-এর মত জুলুমবাজ আর খামখেয়ালি কুঠিয়ালের আর যেন পয়দা না হয়।

প্রজারা এ কথা বলেই কিন্তু খালাস নয়। একদিন তারা হুট করে বলে বসল আমরা আর কিং সাহেবের নীল চাষ করব না। ধর্মঘট।

ধর্মঘট বলতে ধর্মঘট। ধমক-ধামকে কোন কাজ হয় না। বুঝিয়ে বললেও কেউ বুঝে মানেনা। ভয় দেখালে তারাও উল্টো ভয় দেখায়।

কিং সাহেব বললেন না। এভাবে কাজ হবে না। নেটিভরা হল মার খাওয়া জাত। কষে মার লাগাতে না পারলে ওরা সিঁধে হবে না। প্রথমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। কয়েকজনকে ধরে এনে শাস্তি দাও। ঐ দেখে অন্যরা শিখবে। ভয় পাবে।

যেই কথা সেই কাজ। সাহেবের অনুচররা গ্রামে গিয়ে ধরে আনল কয়েকজনকে। কিং সাহেব ওদের কোন কথাই শুনলেন না। হুকুম দিলেন বেঁধে রাখ। খুব কষ্ট দিয়ে বেঁধে রাখ। ওদের কষ্টে সবই যেন শিউরে ওঠে। ধর্মঘটে যেতে আর যেন সাহস না হয়।

ধরে আনা প্রজাদের আটকে রাখা হল। কয়েদখানার চাইতেও খারাপ জায়গায়। একটা গুদামে। তার দরজা-জানালা সব বন্ধ। এই বন্ধ গুদামেই বন্দী করে রাখা হল হতভাগা কৃষক-প্রজাদের।

এ ঘটনায় প্রজারা আরো ক্ষেপে গেল। ধর্মঘট চলতে লাগল আরো জোর-তালে। ক্ষোভের আগুন জ্বলতে থাকে তুষের আগুনের মত।

কিং সাহেব বললেন জুলুম বাড়িয়ে দাও। ওরা মাথা না নুয়ানো পর্যন্ত আমার জুলুম চলবেই।

কিং সাহেবের জুলুম। বিচিত্র তার ধরন।

কিং সাহেবের হুকুমে ধরে আনা হল আরো কয়েকজন প্রজাকে। তাদের মাথায় মাখিয়ে দেয়া হলো কাদা। কিং সাহেব বললেন মাথায় এই কাদা মাখিয়ে দিলাম। এটাই তাদের ধানের ক্ষেত। পাটের ক্ষেত। এই ক্ষেত চষে দিলাম। এবার তোরা

তোদের নিজেদের ক্ষেতে আমার নীল বুনে দে। না দিলে মাথাটাই কেটে তোদের ক্ষেতে পুঁতে দেব।

জুলুমের মুখে টিকতে না পেরে ধরে আনা প্রজাদের কয়েকজন নিজেদের ক্ষেতে গিয়ে ঢুকল। নীল লেঠেলদের পাহারায় তারা নীল চাষ করল। কিন্তু একজন বঁকে বসল জান যাবে তবু নীল ছুঁবো না।

কিং সাহেব বললেন তোর মাথা কেটে পুঁতে রাখব জমিতে।

কৃষক বলল : তাই পুঁতে রাখ। আমার কাটা মাথা থেকে হাজার গণ্ডা মাথা গজিয়ে উঠবে। এত মাথা সামলাবে কি করে সাহেব?

কিং সাহেব তাকালেন কৃষকের দিকে। ছোটখাটো মানুষটি। একবেলা-আধবেলা খেয়ে শরীরটা টিঙটিঙে। তবু গুমোর কমে না। এত সাহস পায় কোথেকে? এখনি এই সাহস গুঁড়িয়ে দিতে না পারলে আখেরে অনেক দুর্গতি রয়েছে। সাহেবের হুকুমে বিদ্রোহী কৃষককে পেটানো হল অনেকক্ষণ। আধমরা নীলের বিষ ঢালতে দেবে না কিছুতেই। নিজের গায়ের রক্ত ঢেলে জমির মাটি ভিজিয়ে দেবে। মাটিতে জন্ম নেবে বিদ্রোহী প্রজা।

রেগে-মেগে সাহেব বললেন ওকে লোহার সিন্দুকে ভর। ভরে পাঠিয়ে দাও বেলকুচি কুঠিতে। ওখানে ওকে আরেক দফা দূরমুজ করা হবে।

সাহেবের এক সাজ বলল : দিনের আলোয় এই সিন্দুক বেলকুচিতে পাচার করা যাবে না। প্রজারা রাস্তার মাঝখান থেকে ছিনিয়ে নেবে সিন্দুক।

সাহেব বললেন ঠিক আছে। রাতের অন্ধকারেই ওর ব্যবস্থা কর।

ব্যবস্থা করা আর হল না। কি করে যেন খবরটা পৌঁছে গেল প্রজাদের কানে। তারা গিয়ে ধরল হাশেম সিকদার আর গোকুল রায়কে। গুঁরা দু'জন যোদ্ধা-কৃষকদের নেতা।

রাতে কুঠিতে বিদ্রোহী কৃষককে সিন্দুকে ভরার প্রস্তুতি চলছে। এ সময় কুঠির চারপাশে জ্বলে উঠল হাজারো মশাল। হাশেম সিকদার আর গোকুল রায়ের নেতৃত্বে দেড় হাজার কৃষক-যোদ্ধা হামলা চালিয়েছে কুঠিতে।

কুঠিতে পালানোর হিড়িক পড়ে গেল। কিং সাহেব যত চেষ্টা করত বিদ্রোহীদের নিকেশ কর, ততই কুঠির লোকজন ভয়ে জড়সড় হয়ে ওঠে। যে যেদিক দিয়ে পারে পালাতে ব্যস্ত। সাহেবের কথা কারো কানে ঢোকে না। কৃষক যোদ্ধারা দখল করে নিল কুঠি। আটক কৃষকদের মুক্ত করে আনল। তারপর ধরা হল কিং সাহেবকে।

তাকে বলা হল সাহেব, সিন্দুক তোমার খুব পছন্দ। এই সিন্দুকে ভরে তুমি আমাদের লোক পাচার করতে চেয়েছিলে। আজ থেকে ঐ সিন্দুকই হবে তোমার বাসাবাড়ি। সেখানে মজাটা কেমন লাগে তুমি হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

কিং সাহেবকে ভরা হল তার সিন্দুকে। কুঠি থেকে সরিয়ে নেয়া হল সাহেব-ভর্তি সিন্দুক।

এরপর থেকে কিং সাহেব গায়েব। গায়েব হয়ে গেলেন গোকুল রায়ও। পরদিন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দু'টো নালিশ। কৃষক প্রজারা কিং সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি এখন নিখোঁজ। নীল সাহেবরা গায়েব করেছে গোকুল রায়কে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জাত। তিনি প্রজাদের নালিশ নিলেন না। গ্রহণ করলেন কিং সাহেবের পক্ষের অভিযোগ। তিনি গোকুল রায়কে গ্রেফতারের জন্য ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং পাবনা ও মালদহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখে পাঠান।

ওদিকে কৃষকরাও বসে নেই। তারা কিং সাহেবের কুঠি গুঁড়িয়ে দেয়। মিশিয়ে দেয় মাটির সাথে। ইংরেজ শাসক সেনাবাহিনী পাঠায় সেখানে।

দীর্ঘদিন অনেক ঝোঁজাঝুঁজির পর পাকুল্লা থানার দারোগার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত কিং সাহেবকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কিন্তু ততদিনে কিং সাহেব যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন।

বিপ্লবী প্রাণে আগুন জ্বলে

‘রহীমুল্লাহ বলে গো আল্লাহ এই বিপদের কালে/আল্লাহ বারুদ নেই মোর ঘরে।
/রহীমুল্লাহর বধু বলে চিন্তা করেন কেনে/পাটির শাড়ি পোড়ায় দেব যত বারুদ লাগে।
/রহীমুল্লাহ বলে গো আল্লাহ এই বিপদের কালে/আল্লাহ গুলি নাই মোর ঘরে।
/রহীমুল্লাহর বধু বলে ভাবনা করেন কেনে/হাসলা-খাড় কাটিয়া দেব যতি গুলি লাগে।’— লোককবি

রহীমুল্লাহ। বারুইখালি গ্রামের এক বিপ্লবী কৃষক। খুলনা জেলার বারুইখালি বা বড়খালি গ্রাম। রহীমুল্লাহর বাড়ি ছোটখাটো দুর্গের মত। নীলকরদের অত্যাচারের কথা ভেবেই সেভাবে বাড়ি বানানো হয়েছে। বাড়ির চারপাশে পরিখা। তারপর নারকেল-সুপারি গাছের সারি। গাছের পাশ দিয়ে উঁচু দরমার বেড়া। রহীমুল্লাহ একজন বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ।

১৮৬১। খুলনা জেলার মোরেলগঞ্জের নীলকর মোরেল সাহেব। তার নামেই মোরেলগঞ্জের নাম।

মোরেল সাহেবের প্রজা হলেন রহীমুল্লাহ।

একদিন রহীমুল্লাহকে ডেকে পাঠালেন মোরেল সাহেব। সব জমাজমিতে নীল চাষ করতে হবে। এখানকার মাটিতে নীলের ফলন ভাল হয়। রহীমুল্লাহ অস্বীকার করলেন। জানালেন, নীলের ফলন দিয়ে সাহেবদের পোয়াবারো। কিন্তু কৃষকদের সর্বনাশ। তিনি তাঁর জমিতে এক দানাও নীল বুনতে পারবেন না। সাহেব অনেক ভয়

দেখালেন, ধমক-ধামক দিলেন। কিন্তু কৃষকের এক জবাব, জান যায় যাবে, তবু জমিতে নীলের আবাদ হবে না। কোনভাবেই রহীমুল্লাহকে রাজি করাতে পারলেন না মোড়েল সাহেব। সংঘাতের সূচনা এখান থেকেই।

২৬ নভেম্বর। ১৮৬১। শেষ রাত।

ঘুমিয়ে আছে বারুইখালি গ্রাম।

শেষ রাতের দিকে চাঁদের আলোয় চুপি-চুপি এগিয়ে এল মোরেলের লোক-লঙ্কর। তিনশ' মানুষের এক বাহিনী। হাতে লাঠি, সড়কি আর বন্দুক। হিনি তাদের নেতা। ডেনিস যুবক হিনি।

তারা ঘুমন্ত গ্রামটিকে ঘিরে ফেলল।

গ্রাম জুড়ে অব্যাহত মাঠ। ফসলের ক্ষেত। এসব ক্ষেতে সব ফসলই হয়। কেবল হয় না নীলের চাষ। মোরেল সাহেবের আফসোসের অন্ত নেই। এখানকার লোকগুলো দুর্দান্ত প্রকৃতির। তাদের নেতা রহীমুল্লাহ। প্রজারা সবাই সাহেবকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, মোরেল সাহেব যেন বারুইখালির মাটিতে নীল চাষের স্বপ্ন না দেখেন।

কিন্তু মোরেল সাহেবের যে স্বপ্ন না দেখলে চলে না। নীলের স্বপ্নই তাঁকে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে টেনে এনেছে এই উর্বর মাটির দেশে। এ স্বপ্নের কবর রচনা করে তিনি কি শুধুই খালি হাতে ফিরে যাবেন? তা কি কখনো হয়?

তাঁর স্বপ্নের পথে বাধা একজনই—রহীমুল্লাহ। তাঁকে বাগে আনতে পারলেই স্বপ্ন পূর্ণ। এ জন্যই আজকের এই অভিযান।

পাখির কিচিরমিচিরে ভোরের আলো ফোটে। জেগে ওঠে ঘুমন্ত গ্রাম। ঘুম থেকে জেগেই গ্রামবাসী বিপদের গন্ধ পায়। নেকড়ে দল ওঁৎ পেতে রয়েছে বাইরে, তারা টের পায়। লাফিয়ে নামে সবাই বিছানা থেকে।

যার হাতে যা আছে তাই নিয়ে সংঘবদ্ধ হয় তারা। ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদার দুশমনের উপর।

মোরেল-বাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তারা প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে। অন্যদিকে গ্রামবাসীরা এ হামলার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তবু তারা অসম সাহস নিয়ে হামলা মোকাবিলা করতে এগিয়ে এসেছে।

শুরু হল দু'দলের লড়াই। সুসজ্জিত মোরেল-বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হতে লাগল কৃষকরা।

রহীমুল্লাহ কাছে দাঁড়িয়ে ঘটনা দেখছিলেন। গ্রামবাসীদের বিপর্যয় দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। হাতে নিলেন একটা লাঠি। ভয়ঙ্কর হু-হুকারে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুপক্ষের উপর। তাঁকে যোদ্ধার বেশে দেখে গ্রামবাসীদের বুকেও সাহসের আগুন জ্বলে উঠল। নতুন উদ্যম নিয়ে তারাও রুখে দাঁড়াল।

রহীমুল্লাহর হাতের লাঠি ভন্-ভন্ করে ঘোরে। লাঠির ঘা যার মাথায় পড়ে তার মাথা দু'ফাঁক, যার গায়ে লাগে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। এভাবে মোরেল সাহেবের বেশ ক'জন অনুচর ধরাশায়ী হল।

ভগি বিবি রহীমুল্লাহর স্ত্রী। তিনিও এগিয়ে এলেন স্বামীর সাহায্যে। স্বামীর এক হাতে লাঠি আরেক হাতে ধরিয়ে দিলেন বন্দুক। রহীমুল্লাহর লাঠি ঘোরে ভন্-ভন্। আর ওদিকে বন্দুক থেকে ছুটে যায় জান-নিকেশ করা গুলি। মোরেল-বাহিনীর অনেকেই হয় লাঠির ঘা খেল, না হয় বন্দুকের গুলি নিল বুক পেতে।

এ সময় হঠাৎ কোথেকে একটা গুলি ছুটে এল। এসে বিধল রহীমুল্লাহর পায়ে। সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল।

রহীমুল্লাহ সরে এলেন ময়দান থেকে। আগে পায়ের যত্ন নিতে হবে যাতে এ জখম তাঁকে কাবু করে না দেয়। তারপর ফের ফিরে আসতে হবে পূর্ণ উদ্যমে।

রহীমুল্লাহ তাঁর বাড়িতে এলেন। পরিখা পেরিয়ে নারকেল-সুপোরি গাছের সারির পাশ দিয়ে এসে বসলেন উঁচু দরমা-বেড়ার পাশ ঘেঁষে। এখানে বসে তিনি তাঁর পায়ের দিকে নজর দিলেন। পায়ে ব্যাভেজ বাঁধতে লাগলেন। মোরেল-বাহিনীর নেতা হিনি খুঁজছিল রহীমুল্লাহকে। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারছিল না। রহীমুল্লাহ পায়ে জখম হয়েছেন, দেখেছিল সে। কিন্তু এরপর থেকে রহীমুল্লাহকে খুঁজে পাচ্ছে না সে। খুঁজতে খুঁজতে রহীমুল্লাহর বাড়ির কাছাকাছি এল হিনি। আড়াল থেকে দেখতে পেল রহীমুল্লাহকে। জখমি পায়ে ব্যাভেজ বাঁধছেন। ব্যাভেজ বাঁধা শেষ হলেই লোকটি উঠে দাঁড়াবেন। তখন আর তাঁকে সামলান যাবে না।

মনস্থির করে ফেলল হিনি। আড়াল থেকেই উচিয়ে ধরল বন্দুক। তাক করল। গুড়ুম। বারুইখালির আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুমল শব্দ হল। রহীমুল্লাহর বুকে এসে ঝাঁপটা দিল গুলি। বারুইখালির মাটি লাল হয়ে উঠল। আপন মাটিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন রহীমুল্লাহ। হায়-হায় করে উঠল বারুইখালি। গ্রামীবাসীদের মনে ভয় এসে জমল। যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। গ্রামের উপর এসে চড়াও হল মোরেল-বাহিনী। শুরু হল অবাধ লুটপাট। বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। যা নেয়া যায় না, যা আগুনে পুড়ে না, সেসব জিনিস ফেলে দেয়া হল পানিতে। সামনে যাকে পাওয়া গেল তাকেই ধরে পিটানো হল। যুবতী মেয়েদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হল। রহীমুল্লাহর স্ত্রী ভগি বিবি আর তাঁর বোনও নিন্তার পেল না। মোরেল-বাহিনী ফিরে যাওয়ার সময় রহীমুল্লাহর লাশটিও নিয়ে গেল।

বিপ্লবী রহীমুল্লাহকে খুন করেও মোরেল সাহেব বারুইখালির জমিতে নীল চাষে সুখ পাননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভারত ছাড়তে হয়েছিল।

বারুইখালি ঘটনা নিয়ে দীর্ঘদিন মামলা চলেছিল। মামলা মানে মামলা নামের প্রহসন নাটক।

দায়রার বিচারে মোরেলের অনুচর দৌলত চৌকিদারের ফাঁসি হয়। কিন্তু ঘটনার মূল নায়ক সাহেবর-চক্র বেঁচে যায়। মামলার রায়ে ৩৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও আরো অনেকের বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি হলেও সাক্ষ্য-সাবুদের প্রমাণ সত্ত্বেও মোরেল-বাহিনীর নেতা খুনী হিনি বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

মোরেল সাহেব তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি ফেলে মোরেলগঞ্জ থেকে পালিয়ে যান। বোধের কাছে তিনি ধরা পড়েন। হাইকোর্টের বিচারে তিনি বেকসুর খালাস পান। কিন্তু বিপ্লবী রহীমুল্লাহর আত্মা তাঁকে তাড়া করে ফিরছিল। তিনি কালবিলম্ব না করে বাংলাদেশ ত্যাগ করে যান।

বিদ্রোহী বিশ্বাস

নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রাম। এখানেই বিশ্বাস ভাতৃদ্বয়ের আবাস। বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। একজন জোতদার। আরেকজন মহাজন। দু'জনেই নীলকুঠির দেওয়ান। একদিন তাঁদের চোখ খুলে গেল। গরীব প্রজা কৃষকদের উপর নীলকর সাহেবের এই অন্যায় জুলুম আর তো সহ্য করা যায় না। তাঁরা দেখতে পেলেন, প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি। তাঁরা ভাবলেন, এই আগুনকে আরো উষ্ণে দিতে হবে। আরো সংগঠিত রূপ দিতে হবে। দুই ভাইই কুঠির দেওয়ানি ছেড়ে দিলেন। এসে যোগ দিলেন কৃষকদের সাথে। তাদের জন্যই গ্রামে গ্রামে ঘোরা। ঘুরে ঘুরে বিদ্রোহের আগুন আরো জ্বালিয়ে দেয়া। কৃষকদের সংগঠিত করা। এই হল তাঁদের কাজ। চাষীরা নীল বোনা বন্ধ করে দিল। কুঠি বন্ধ হয়ে গেল। কৃষকদের নামে নালিশ হতে লাগল। দুই ভাই এগিয়ে এসে প্রজাদের জরিমানা আর দাদনের টাকা শোধ করতে লাগলেন। মামলার খরচ যোগান দিলেন। জেলবাসী প্রজাদের পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করলেন। এই করে তাদের সর্বস্ব খোয়ানোর যোগাড়। এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেল সতের হাজার টাকা।

দুই ভাই প্রজাদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এই স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রাম পাহারা দেয়। এর মধ্যে চাষীরা তীর-ধনুক, লাঠি-সড়কি চালনা শিখল।

কুঠিয়াল দেড় হাজার ভাড়াটে লেঠেল নিয়ে আক্রমণ করল লোকনাথপুর গ্রাম। বিশ্বাস ভাতৃদ্বয়ের অনুপ্রেরণায় গ্রামের চাষীরা এমন ধারার হামলার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। তারা পাল্টা রুখে দাঁড়াল। গুরু হল তুমুল লড়াই।

সংগঠিত প্রজাদের সামনে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কুঠিয়ালের ভাড়াটে লেঠেলরা জান হাতে নিয়ে ছুটে পালাল।

বিজয়ী গ্রামে উৎসবের আনন্দ নামে।

ঘোড়সওয়ার দুরন্ত তরুণ দল

পাবনা জেলার বার পাখিয়া। এখানে একটা বড়সড় নীলকুঠি। কুঠিয়াল সাহেবের জুলুমের অন্ত নেই।

এর কাছাকাছি কাউনিয়া গ্রাম। ঐ গ্রামের মাতব্বরদের এক দল ছিল। বয়েসে তরুণ। তেমনি দুরন্ত। ঘোড়া ছুটাতে তাদের জুড়ি নেই। দল বেঁধে তারা ঘোড়া ছুটায়। যে পথ দিয়ে তারা যায় সে পথে ধুলোর ঝড় ওঠে। প্রতিধ্বনি তোলে ছুটন্ত ঘোড়ার খুর।

একদিন তরুণ দল ঘোড়ায় যাচ্ছিল। কাছেই নদী। তাদের ইচ্ছে, সে নদীতে গোসল করবে। এ সময়ই তাদের নজরে এল দৃশ্যটি। নীলকুঠির কয়েকজন পেয়াদা চলেছে। সাথে দু'জন কৃষক। কৃষক দু'জনকে পিঠমোড়া করে বাঁধা। দু'জন আসামিকে তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে নীলকুঠিতে।

দূর থেকে দেখেই থমকে দাঁড়াল ওরা পাঁচজন। দাঁড়িয়ে গেল পাঁচটি ঘোড়া। একজন বলল : কি ব্যাপার? ওরা কারা?

আরেকজন বলল বার পাখিয়ার নীলকুঠির পেয়াদা দল মনে হচ্ছে।

আরেকজন বলল ওদের সাথে দু'জন গাঁয়ের লোক দেখা যাচ্ছে। পিঠমোড়া করে বাঁধা।

আরেকজন বলল আরে, ওদেরকে তো চিনি। পাশের গাঁয়ের দুই কৃষক।

আরেকজন বলল হ্যাঁ, মনে পড়ছে। দু'দিন আগে নীলকুঠির লোকজন ওদের গাঁয়ে গিয়েছিল। ওদেরকে নীলের দাদন নিতে বলেছিল। নীলের বীজ সেধেছিল। ওরা নেয়নি। নীলবাবুদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

তরুণদের মধ্যে বড়সড় ছেলেটি বলল বোঝা গেল নীলকুঠির পেয়াদারা কেন ওদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ধানের ক্ষেতে নীল বুনাতে চায়নি। কুঠিতে গিয়ে তার শাস্তি নিতে হবে। কিন্তু তাতো হতে পারে না। আমাদের চোখের সামনে ওদেরকে ধরে নিয়ে যাবে, আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হজম করব, তা হতে পারে না।

বাকী চারজন একযোগে বলে উঠল ঠিক ঠিক।

সাথে সাথেই পাঁচজনের চুপি-চুপি শলা-পরামর্শ শুরু হয়ে গেল। তারপর ওরা সিঁধে হয়ে বসল। পাঁচটি ঘোড়া ডেকে উঠল চিহ্নি-হিঁ করে।

পেয়াদারা আসছিল মনের আনন্দে। মানুষ ধরে নিয়ে যেতে আর আচ্ছন্ন পেটাতে বেজায় সুখ। তারা খোদ ফেল্টন সাহেবের খাস পেয়াদা। তাদের দেখে সাত গাঁয়ের লোক থরথরিয়ে কাঁপে।

পেয়াদাদের সরদার দাঁত কিড়িমিড়ি করে চাষী দু'জনকে বলল বুকে তোদের বেজায় পাটা। মুখের উপর বলে দিস, ধানের ক্ষেত্রে নীল বুনাবি না। এবার তোদের বুক পিটিয়ে ভাঙব। ভাঙ্গা বুকোর উপর নিজের হাতে নীল বুনাবি।

চাষীদের একজন শব্দ করে থুতু ফেলল। থুতু এসে পড়ল সরদারের পায়ের কাছে। তেজ দেখে সরদারের মাথা গরম। হাতের লাঠি উঁচিয়ে ধরল বেদম কষে ঘা লাগানোর জন্য।

এ সময়ই খটখট শব্দ। মুখ তুলে দেখে পাঁচটি ঘোড়া এগিয়ে আসছে। কোন কিছু বোঝার আগেই ওদের পাশ দিয়ে পাঁচ ঘোড়া ছুটে গেল সাঁ-সাঁ করে। সরদারের হাতের লাঠি পড়ে গেল। ঘোড়ার ধাক্কায় দু'জন পেয়াদা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। তাই দেখে চাষী দু'জন হেসে উঠল।

পেয়াদারা পেছন ফিরে তাকাল। দেখে, পাঁচটি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়েছে। তেড়ে-মেড়ে ছুটে আসছে আবার।

ঘোড়া যায় আর আসে। সাথে সাথে দাপিয়ে চলে ঘোড়ার পা। পায়ের ঘা এসে পড়ে পেয়াদাদের উপর। ঘায়ে ঘায়ে সব ক'জন পেয়াদাই লুটিয়ে পড়ে পথের ধুলোয়। সারা শরীরে মুখে ঘোড়ার লাথির চিহ্ন। ক্ষতবিক্ষত। গলগলিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

চাষী দু'জন মুক্ত। তারা হাসতে হাসতে চলে যায়। চলে যায় ঘোড়সওয়ার পাঁচজন। আহত ক্ষত-বিক্ষত পেয়াদারা রাস্তার ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে খেতে ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে দেখে।

গর্তের ফাঁদে ফেল্টন সাহেব

তরুণরা বলল গোল-বৈঠকে। সবুজ ঘাসের মাঠে।

একজন বলল নাহ! নীলকুঠির পেয়াদাদের পিটিয়ে শান্তি পাওয়া গেল না।

আরেকজন বলল আমরা পিটালাম কোথায়? পায়ের সুখ তো মিটিয়ে নিল আমাদের ঘোড়াগুলো।

আরেকজন বলল ওরা তো চুনোপুটি। বেতনভুক কর্মচারি। ধরতে হবে গোঁদাটাকে। ওকে আচ্ছামত শায়েস্তা করতে না পারলে কোন শান্তি নেই।

আরেকজন বলল ঠিক। অই ফেল্টন ব্যাটাকে একটা জনোর মত শিক্ষা দিতে হবে। ওর শাদা চেহারাটাকে নীলচে বানিয়ে দিতে হবে।

আরেকজন বলল : সাহেব ব্যাটাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে বাংলাদেশটাকে হাড়ে হাড়ে চিনতে পারে।

বড়সড় ছেলেরি বলল সেই বুদ্ধিই তো মাথা খেলিয়ে বার করতে হবে।

ওরা সবাই বলে উঠল ঠিক। ঠিক।

পাঁচ তরুণের মুখে হাসি ফুটল। চোখ দুটোমিতে চিকচিক করে উঠল।

কায়দামত বুজ্জিটা বের করেই ওরা লেগে গেল কাজে। ক'দিন খুব ভাল করে লক্ষ্য করল, ফেল্টন সাহেব কোন কোন পথে রোজ ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। তার মধ্যে একটি পথ যেন সাহেবের খুব পছন্দের। ওপথে তার যাওয়া চাই-ই চাই। পথটা পছন্দ হল পাঁচ তরুণের।

একদিন সাহেবের নিরিবিচি চলা রাস্তার উপর পাঁচ তরুণ এসে দাঁড়াল। চারপাশে জনমনিষ্যির কোন চিহ্ন নেই। ওরা রাস্তা খুঁড়তে শুরু করল। খুঁড়তে খুঁড়তে বেশ বড় রকমের একটা গর্ত হল। তরুণরা সন্তুষ্ট হল। হ্যাঁ, এই গর্তেই চলবে। কিন্তু গর্ত দেখলে তো সাহেব আর এই পথ মাড়াবে না। গর্তটা যাতে কোনভাবেই দেখা না যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। ওরা অনেক ঘাস, লতাপাতা যোগাড় করে নিল। গর্তের মুখটা সুন্দর করে লতাপাতা আর ঘাসে ঢেকে দিল। কাছে থেকে দেখেও এখন বোঝার উপায় নেই যে এখানে একটা মরণফাঁদ বানিয়ে রাখা হয়েছে।

এসময়ই ভেসে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। ঐ সাহেব আসছে। তার সাধের নীলের জমি দেখতে যাচ্ছে।

তরুণরা গাছ-গাছালির আড়াল নিল। ঘোড়ায় চরে আসছে ফেল্টন সাহেব। মনে তার বেজায় ফুর্তি। এদেশটা যেমন উর্বর, তেমনি সস্তা এর জনশক্তি। প্রায় বিনা খরচাতেই নীলের আবাদ হচ্ছে। এই নীল ইউরোপে পাঠিয়ে কামাই হচ্ছে কাড়ি-কাড়ি টাকা। এ ক'দিনেই বেশ জমিয়ে নেয়া হয়ে গেছে। এর উপর আছে শত শত লোকের উপর খবরদারি। নিজেকে তো বাদশা-টাদশা বলেই মনে হয়।

সুখ-স্বপ্নে বিভোর ফেল্টন সাহেব। তার নাদুসনুদুস-ঘোড়াটিও চলছে দুলাকি চালে।

হঠাৎ কি হল, বুঝে উঠতে পারল না ফেল্টন সাহেব। ঘোড়াটা হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে নিচে। তার সাথে সাথে সাহেবও। ভূমিকম্পে কি মাটি দু'ফাঁক হয়ে গিয়েছে? সেই ফাঁক হওয়া মাটির অতলের হারিয়ে যাচ্ছে সাহেব ও তার ঘোড়া? জ্ঞান হারাল সাহেব।

জ্ঞান ফিরে দেখে ঘোড়াটি মরে গেছে। তার উপরে পড়েছিল বলে সাহেব এখনো বেঁচে আছে। সারা শরীরে জ্বালা। হাত-পায়ের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ভেসেই গেছে বোধ হয়।

কঁকিয়ে উঠল সাহেব। সাথে-সাথেই খিল খিল হাসি। সাহেব উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে, একদল তরুণ তার সঙ্গীন অবস্থা দেখে কৌতুক বোধ করছে। সাহেব করুণ কণ্ঠে আর্তি জানাল। এখান থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

একজন তরুণ বলল : এদেশে তো একাই এসেছে নীলের বীজ নিয়ে। একা-একাই উঠে এস।

বাথায় সাহেব আর্তনাদ করে উঠল। বলল আমাকে এখান থেকে তুলে নাও। তোমাদেরকে অনেক পুরস্কার দেব।

আরেক তরুণ বলল : না সাহেব, তোমার পুরস্কার আমাদের জন্য বদহজম।

সাহেব আবার বলল তোমাদের অনেক টাকা দেব।

একজন রাগী তরুণ বলল তোমার টাকায় নীলের বিষ। ও টাকায় আমরা থুথু দিই।

বলেই সে সাহেবের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিল।

সাহেবের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু রাগ দেখালে আরো বিপদ। রাগ সামলে-সুমলে বলল এবারের মত আমাকে রক্ষা কর, এরপর তোমাদের উপর কোন জুলুম করব না।

আরেক তরুণ বলল সাপ, বিছু আর বিলেতি সাহেবকে বিশ্বাস করতে নেই। বিপদ কেটে গেলেই তারা ফোঁস-ফুসিয়ে ছোঁবল তোলে।

সাহেব কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল দোহাই তোমাদের, মিনতি করছি। আমাকে বাঁচাও।

তরুণদের একজন ব্যঙ্গ করে বলল : আহা! কী করুণ গলা! সাহেব, এদেশের কৃষকরাও তোমার পায়ে ধরে এমনি করে কাকুতি-মিনতি করেছে। তাদের কোন আওয়াজই তোমার কানে ওঠেনি। তুমি কি আশা কর যে তোমার মায়াকান্নায় আমরা গলে যাব?

সাহেব পা নাড়াতে গিয়ে কঁকিয়ে উঠল। আতর্জনাদ করে বলে উঠল : ওরে বাপরে! পা-টা আমার পুরোপুরিই ভেঙ্গে গিয়েছে।

তরুণদের একজন মুখে সান্তনার টকটক শব্দ তুলে বলল আহা বেচারা! পা-টা গিয়েছে। সাহেব পা ভেঙ্গেছে তো কি হয়েছে? কারো ভাগে তোমার মত এমনি গর্তে, আবার কারো ভাগে তোমার মত সাহেবের বুটের লাথি খেয়ে। ভাঙ্গা পা নিয়েই তোমার পেয়ারের ঘোড়ার মৃতদেহের উপর পড়ে থাক। এদেশের মজাটা টের পেয়ে নাও।

সাহেব আতর্জনাদ করে উঠল।

বিচারের উল্টো রায়

সাহেব ভাঙ্গা পা আর সারা শরীরে জখম নিয়ে কুঠিতে ফিরল। তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল পাঁচজন তরুণের উপহাসের হাসি। সাহেবের সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠছে।

গোলাম রইছ খাঁ। গ্রামের মাতব্বর। লোকজন তাঁকে একবাক্যে মান্যগণ্য করে।

ফেল্টন সাহেব নালিশ নিয়ে এল গোলাম রইছ খাঁর কাছে। সারা গায়ে রান্ধি হয়ে পড়েছিল সাহেবের এই অপদস্থ হওয়ার কাহিনী। গোলাম রইছ খাঁর কানেও পৌঁছেছিল

ঘটনাটি। তিনি মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন। যে কাজে তাঁরা প্রবীণ মাতবররা করতে পারেননি, সেটিই করেছে তরুণ দল।

গোলাম রইছ খাঁ ফেণ্টন সাহেবের কাছে আবার গুনলেন ঘটনাটি। সাহেব সবিস্তারে তার দুর্গতির-বিবরণ দিয়ে দাবী জানাল। ঐ দুষ্ট ছেলেদের বিচার করতে হবে। তুমি যদি বিচার করতে না পার, আমাদের হতে ওদেরকে তুলে দাও।

সব শুনে গোলাম রইছ খাঁ বললেন ওরা কারা?

সাহেবের সাফ-সাফ জবাব ঐ দুষ্ট ছেলের দল। নটোরিয়াস বয়েজ।

গোলাম রইছ খাঁ মৃদু হেসে বললেন ঐ বললেই তো হয় না। দুষ্ট ছেলের দল কোন নাম নয়। তোমার বিবাদী কারা? কাদের বিরুদ্ধে তোমার নালিশ? মামলা? ওদের নাম-ধাম-মোকাম বল। তারপর না বিচার হবে।

সাহেব রেগে-মেগে বলল ড্যাম ইওর নাম-ধাম। আমি ওদের বিচার চাই।

গোলাম রইছ খাঁ বললেন : বেশ তো, বিচার হবে। আসামীদের নাম বলতে পারছ না, বিচার করব কার? আর কোথাই-বা তোমার সাক্ষী-সাবুদ?

সাহেব বলল আমার সাক্ষী আমিই। আর কোন সাক্ষী লাগবে না।

গোলাম রইছ খাঁ এবার বিরক্ত হলেন। বললেন দেখ সাহেব, তোমাদের যেমন জংলী আইন, তেমন বিচারের চেহারা। ঐ বিচারেও আসামীর নাম লাগে। নাম না বলতে পারলে কাকে ধরে শাস্তি দেব?

সাহেবের এক গোঁ : আমি বিচার চাই।

গোলাম রইছ খাঁ গম্ভীর হয়ে বললেন বেশ। তাহলে বিচারই হোক। সাহেব বাদী হয়ে যে মামলা এনেছে তার কোন সাক্ষী নেই। একমাত্র বাদীই তার নিজের সাক্ষী। সুতরাং এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না।

বিচার সভায় গ্রামের লোকজন উপস্থিত ছিল। তারা বলে উঠল ঠিক ঠিক।

গোলাম রইছ খাঁ মামলার রায় ঘোষণা করতে থাকলেন : যারা সাহেবকে অপদস্থ করেছে, কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছে, সাহেব তাদের কারুরই নাম বলতে পারেনি। সুতরাং আমি রায় ঘোষণা করছি যে এ বিচার চলতে পারে না। মামলা ডিসমিস।

গাঁয়ের লোকরা আনন্দ চিৎবে বলে উঠল মারহাবা! মারহাবা!

সাহেব রেগে-মেগে স্থান ত্যাগ করল। যাওয়ার সময় ঘোষণা দিয়ে গেল এ দুঃসাহসের বিচার আমি নিজ হাতে করব। আমার পা ভাঙ্গার প্রতিশোধ আমি নিজেই নেব।

গোলাম রইছ খাঁ হেসে বললেন : পুরো গ্রাম তোমার বিচারের অপেক্ষায় থাকবে।

ফেণ্টন সাহেব গ্রাম থেকে নীলকুঠিতে ফিরে এসেই উদ্যোগ-আয়োজনে নেমে পড়ল। তার বুকের ভেতর অপমান ও প্রতিশোধের আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছে। সে তার লেঠেল বাহিনীকে তলব করল। তাদেরকে নিয়ে গ্রাম আক্রমণ করার জন্য রওনা হল। সাহেব নিজে চড়ল একটা ঘোড়ার উপর।

এ খবর বাতাসের আগে পৌঁছে গেল গাঁয়ে। সাথে সাথে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। এহসান খাঁ, গুলজার খাঁ ও জাহান্দর খাঁ সাত গাঁয়ের নামকরা লেঠেল। তাদের নেতৃত্বে পুরো গ্রাম প্রভুত হয়ে রইল।

ফেল্টন সাহেব মনে করেছিল, তার লেঠেল বাহিনী নিয়ে নির্বিবাদে গাঁয়ে ঢুকে যাবে। তারপর পুরো গ্রামটাকে তছনছ করে মাতবরদেরকে ধরে এনে বন্দী করে রাখবে তার নীলকুঠিতে। একটি-একটি করে প্রত্যেকের হাত-পা গুড়িয়ে দিয়েই তবেই হবে তার শাস্তি।

কিন্তু গ্রামে ঢুকতে গিয়ে দেখতে পেল, পরিস্থিতি অন্য রকম। গ্রামের কাছে আসতে না আসতেই বাঘা বাঘা লেঠেলদের নেতৃত্বে গ্রামের লোকদের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তার লেঠেল বাহিনীর উপর। পোষা কুস্তাগুলো দুই ঘা খেয়েই পড়ি-মরি করে পাততাড়ি গুটিয়ে দৌড়ে পালাল।

ফেল্টন সাহেবও অবস্থা বেগতিক দেখে পালানোর পথ খুঁজছিল। কিন্তু তার আগেই ধরা পড়ে গেল গ্রামবাসীদের হাতে।

আবার বিচার সভা বসল। এবার ফেল্টন সাহেবের বিচার। আসামী ফেল্টন সাহেব। বাদী গ্রামবাসীরা।

গোলাম রইছ খাঁ বললেন সাহেব, তুমি আমাদের কাছে বিচার দিয়েছিলে। কিন্তু আসামীদের নাম বলতে পারনি। এবার নালিশ দিয়েছে গ্রামবাসীরা। বিবাদী আসামী তুমি। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তুমি তোমার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে গ্রামে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইছিলে। গ্রামের শাস্তি নষ্ট করতে চেয়েছিলে। এছাড়াও তুমি নীল চাষের নাম করে গ্রামের লোকদের উপর নির্বিচারে জুলুম চালিয়েছ এতদিন। বলো, তোমার কিছু বলার আছে কিনা।

ফেল্টন সাহেব হাতজোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আমাকে মাফ করে দাও।

গোলাম রইছ খাঁ বললেন এবারের মত তোমাকে জানে বাঁচানো যেতে পারে। তবে শর্ত একটাই।

ফেল্টন সাহেব বলল আমি আর জুলুম করে নীল চাষ করব না। এই শেষ।

গোলাম রইছ খাঁ বললেন শুধু জুলুমবাজি না করার কথা দিলেই চলবে না। তোমাকে হলফ করে অস্বীকার করতে হবে, তুমি আজ এই মুহূর্তে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোনদিকেই মুখ ফিরিয়ে তাকাতে পারবে না।

ফেল্টন সাহেব এই রায় মাথা পেতে গ্রহণ করল।

সেদিনই সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল।

পেছনে পড়ে রইল তার নীল চাষের দুঃস্বপ্ন।

এমুখো সে আর কোনদিন হয়নি।

দুশমন যখন মেহমান

কুতুবপুর। এখানে কিছুদিন আগে নীল-দাঙ্গা হয়েছে। আসামীদের দলে-দলে ধরে চালান দিতে হবে।

যশোর থেকে এসেছেন শ্রীদুর্গদাস লাহিড়ী। সাথে একদল পুলিশ। আসামী কারা সঠিক জানা নেই তাদের। অকুস্থলে এসেছে দারোগা বাবু। পথে খুব ঝুঁকি গিয়েছে। বিশ-বাইশ ক্রোশ পথ তাকে পায়ে হেঁটেই আসতে হয়েছে। এমনিতে বর্ষার মওসুম। পথ-ঘাট কাদায় মাখামাখি। এই কাদা ভেঙ্গেই তিনি সদলবলে কুতুবপুরে এসে যখন পৌঁছলেন তখন রাত দশটা। পাড়াগাঁয়ের রাত দশটা মানে অনেক রাত। চারপাশে নিঃসাড় শ্রুতি।

দারোগা বাবু এসে পৌঁছালেন ওয়াসিম বিশ্বাসের বৈঠকখানায়। সম্পন্ন গৃহস্থ, দেখেই বোঝা যায়। রাতের আশ্রয় হয়ত জুটবে এখানেই। সকাল বেলায় তদন্তের ব্যাপারটি দেখা যাবে।

দুর্গাদাস লাহিড়ী নিষ্ঠাবান হিন্দু। যত রাতই হোক আর খিদেয় যতই পেট চোঁ-চোঁ করুক, বাছ-বিচার না করে তিনি জাত-পাত হারাতে রাজী নন।

ওয়াসিম বিশ্বাস এত রাতে মেহমান দেখে দ্বিভ্রান্তি করলেন না। সাদরে গ্রহণ করলেন পুলিশ দলকে। ইতোমধ্যে তিনি টের পেয়ে গিয়েছেন, কেন তাদের এ গাঁয়ে আগমন।

ওয়াসিম বিশ্বাস কৃষক বিদ্রোহের একজন নেতা। দারোগা বাবু তাঁরই দুশমন। তাই বলে এত রাতে মেহমানকে বাইরে ঠেলে দেয়া যায় না। তিনি ক্ষুধার্ত দারোগা বাবুকে অনুরোধ জানালেন, চারটি কিছু মুখে দেয়ার জন্য। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু দারোগা বাবু কিছুই মুখে তুলবেন না।

অনেক পীড়াপীড়িতে অবশেষে দারোগাবাবু বললেন এত করে যখন বলছেন, তখন কিছু মুখে না তুললে গৃহস্থের যেমন অকল্যাণ, তেমনি অতিথিরও। যদি সদা ভাজা খে আর কুয়োর জল হয়, তাহলে তা গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি নেই।

ওয়াসিম বিশ্বাস একটু ভাবলেন। তারপর বললেন ঠিক আছে, তাই হবে। আপনারা একটু বিশ্রাম নিন। আমি আয়োজন দেখছি।

ওয়াসিম বিশ্বাস বৈঠকখানা থেকে অন্দরমহলে চলে গেলেন।

পথ চলার ক্লান্তিতে পুলিশ দল অবসন্ন। তাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। সবাই বিছানায় গড়িয়ে দিল দেহ। মুহূর্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়লেন দারোগা বাবুও।

কতক্ষণ ঘুম হল জানা নেই। যখন ঘুম ভাঙল তখন শেষ রাত।

প্রথম ঘুম ভাঙল দারোগা বাবুর। বাইরে এক দল লোকের হুল্লায় তিনি জেগে উঠলেন। এসেছেন শত্রুদের গাঁয়ে। তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন না তো? নাকি ডাকাত পড়েছে বাড়িতে?

তিনি সাথে সাথে পুলিশদের সবাইকে জাগিয়ে তুললেন। সবাইকে আদেশ দিলেন প্রস্তুত হয়ে থাকার জন্য। নিজেও একটা বন্দুক টেনে নিলেন। এসে দাঁড়ালেন বাইরে।

এমন সময় সদর দরজা খুলে এসে উপস্থিত হলেন ওয়াসিম বিশ্বাস। দারোগা বাবুকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন বড় বাবু, উঠে পড়েছেন?

দারোগা বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী গৃহস্থামীকে দেখে আশ্বস্ত হলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন ওয়াসিম বিশ্বাসের দিকে। বললেন : কি ব্যাপার? ভেতরে এত গোলমাল কেন?

ওয়াসিম বিশ্বাস সবিনয়ে বললেন মাফ করবেন বড় বাবু, একটু দেরী হয়ে গেল। মেয়েরা কিছু খে ভেজে ধান বেছে ফেলছে। আর ছেলেদের দল মিলে একটা কুঁয়ো কেটেছে। পানির ঘোলাটা এখনো কাটেনি, একটু সময় লাগবে।

গৃহস্থামীর এই অতিথিপরায়াণতা দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন দারোগা বাবু। আবেগাপ্ত হয়ে তিনি জড়িয়ে ধরলেন ওয়াসিম বিশ্বাসকে। বললেন ভাই, ঘোলা কাটাবার প্রয়োজন নেই। তুমি এই ঘোলা জলই নিয়ে এসো। ওটা জল নয়, অমৃত।

সকাল বেলায় দুর্গাদাস লাহিড়ী ওয়াসিম বিশ্বাসকে জানালেন কুতুবপুরে তার আসার কারণ। আসামীদের একটা নামের তালিকা ওয়াসিম বিশ্বাসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন এদেরকে একটা হাজির করিয়ে ধরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর।

তালিকাটি দেখে মৃদু হাসলেন ওয়াসিম বিশ্বাস। তালিকায় নাম যাদের রয়েছে তাদের সবাইকে দারোগা বাবুর সামনে হাজির হওয়ার হুকুম দিলেন। দশ-বারোজন বলিষ্ঠ জোয়ান এসে উপস্থিত হল। তাদের সবার গায়ে কাদা-বালি মাখা। এরাই দারোগা বাবুর জন্য সারারাত ধরে কুয়ো খনন করেছে।

ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন দারোগা বাবু শ্রী দুর্গাদাস লাহিড়ী। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। আপনাকেই তাঁর মাথা নুইয়ে এল। মাথা নিচু করেই তিনি বললেন যাও। তোমরা খালাস।

চিনি বিবির বীরত্ব

সিন্দুরিয়া। কুঠিয়াল হল উইলিয়াম শেরিফ। প্রজাদের উপর যেমন তার জুলুম, তেমনি অনুচরদেরও।

শেরিফের বাথান ও গরুর রাখালরা সন্ধ্যার পর গরুর পাল দিয়ে চাষীদের মাঠের ছোলা আর মসুর জাতীয় রবিশসা খাওয়ায়। এই নিয়ে কারো প্রতিবাদ করার সাহস নেই। কুঠিয়ালের ভয়। এ গাঁয়েই রয়েছে বাসের মণ্ডলের স্ত্রী চিনি বিবি। কুঠিয়ালের অনুচরদের এই জুলুমবাজি দেখে অস্থির হয়ে ওঠেন চিনি বিবি। একরাতে তিনি পুরুষের বেশ পরলেন। একটা বাঁশের লাঠি হাতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। একাই

তিনি আক্রমণ চালালেন কুঠিয়ারের অনুচরদের উপর। দুই-তিনজন রাখালকে আহত করলেন। একাই তিনি পালের সব গরু ছিনিয়ে আনলেন। এই রাতেই তিনটি মোটাতাজা ষাড় জবাই করে গোশত বিলিয়ে দিলেন। ঘুণাঙ্করেও কেউ টের পায়নি, কাজটি কোন পুরুষের নয়, একজন বীর রমণীর।

পরে এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশের হয়রানি, মামলা-মোকদ্দমা অনেক কিছু হল। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্ত করতে না পারায় কাউকে শাস্তি দেয়া যায়নি।

বিশে ডাকাত

নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের বিশ্বনাথ সরদার। উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহের এক মহানায়ক।

চাপড়া থানার গাদড়া-ভাতছালা গ্রামে তাঁর জন্ম। জাতে ব্যগ্র ক্ষত্রিয় বা বান্দি। বাপ-দাদারা ছিলেন কৃষক।

বালক বয়সেই বিশ্বনাথের মনে নীল সাহেবদের বিরুদ্ধে তুষের আগুন জ্বলে ওঠে। সেই আগুনই বিশ্বনাথের মনে ধিক-ধিক করে জ্বলে চলে তাঁর সারাটি জীবন।

বালক বয়সে তিনি তাঁর বাবাকে চাষাবাদে সাহায্য করতেন। এ সময়ই তাঁর চোখের সামনে একের পর এক চলতে থাকে নীলকরদের তাণ্ডব জলুম। এদেশের কৃষকদেরকে তারা মানুষ বলে মানত না।

দেখে দেখে ক্ষোভ জমে ওঠে মনে। শপথ করেন, এ জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াবেন। বুকের আগুন জ্বালিয়ে তিনি যুবক হয়ে বেড়ে ওঠেন। তাঁর হৃদয়-মনে, চিন্তায়, চেতনায়, স্বপ্নে-জাগরণে একই ধ্যান।

এইভাবে বিক্ষুব্ধ যুবক বিশ্বনাথ বিপ্লবী বিশ্বনাথে বদলে যান। চাপড়ায় তখন ছিলেন একজন ওহাবী বিপ্লবী ইসমাইল হোসেন। তিনি বিশ্বনাথকে পরিচয় করিয়ে দেন তিতুমীরের হামকল বাহিনীর সাথে। এই হামকল বাহিনীর কাছেই তিনি প্রশিক্ষণ নেন।

তারপর ফিরে আসেন স্বগ্রামে। গাঁয়ে মজলুম কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করেন। গাঁয়ের যুবকদেরকেও তিনি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেন। বিশ্বনাথের এক লক্ষ্য এক ধ্যান; নীলকুঠি আর নীলকরদের ধন-সম্পদের ভাণ্ডার ও গোলাবাড়ি দখলে নিয়ে ধ্বংস করে দেয়া। লুটতরাজ করা। নদীয়া জেলার কুনিয়ার জঙ্গলে তার গোপন ঘাঁটি। এখান থেকেই চলে তাঁর নীলকুঠি আর নীল বাজারের বিরুদ্ধে অভিযান। এভাবে দক্ষিণে গঙ্গা থেকে শুরু করে উত্তরে ভৈরব পর্যন্ত চূর্নী নদীর পাশের গ্রামগুলোর বিদ্রোহী নীলচাষী ও ইংরেজ বিরোধী যোদ্ধাদের তিনি নেতা হয়ে ওঠেন। চুয়াডাঙ্গা এলাকার খান বোয়ালিয়া কনসার্নের সব কুঠি, হাঁসখানি, মঞ্জুরহাট, কৃষ্ণপুর, বাবলাবন, রাণীনগর, চন্দননগর, চৌগাছা, গোবিন্দপুর, আসাননগর—এসব এলাকার নীলকুঠিগুলো তাঁর

হামলার শিকার হয়ে পড়ে। হামকল বাহিনীর যোদ্ধা জামাল উদ্দিন আহমদ ছিলেন তাঁর উপদেষ্টা ও পরিচালক।

হামলা আর লুটতরাজে অস্থির হয়ে ইংরেজ সরকার আর নীলকররা বিশ্বনাথকে বিশেষ ডাকাত নামে ডাকতে শুরু করে। তাঁর পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয় পুলিশ ও গোয়েন্দা। তাঁকে শ্রেয়তারের জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়।

দীপালি উৎসবের আড়ালে

স্যামুয়েল ফেডি। মোল্লাহাটি কনসার্নের কুঠিয়াল। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর এলাকায় তার নীলের কারবার। এ কারবারে নেমে ফেডি জুলুম-শোষণের তাণ্ডব শুরু করে দেয়। কৃষকরা অত্যাচারে জর্জরিত হতে হতে মনে মনে তার মুণ্ডপাত করে, ধ্বংস চায়। কিন্তু সামনাসামনি কিছু বলার সাহস পায় না।

নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট ফেডির পৃষ্ঠপোষক। তার বাংলায় ফেডির নীলকুঠি ও বাসভবন।

ইলিয়ট ও ফেডির নানান ধরনের অত্যাচারের খবর এসে পৌঁছে বিশ্বনাথের কানে।

তখন বিশ্বনাথ প্রতিজ্ঞা করেন, ফেডির একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে হবে।

দীপালির এক রাত। উৎসবে মেতেছে গ্রাম। তার ঢেউ এসে লেগেছে ফেডির কুঠিতেও। পানাহার চলছে প্রাণ-ভরে।

এ সময় আর্দালি ছুটে এসে খবর দিল ফেডিকে আর নিস্তার নেই। বিশেষ ডাকাতের দল আসছে। সব লুটেপুটে নেবে। যাকে সামনে পাবে তারই জান নিকেশ করে দেবে।

গুনেই ফেডি সতর্ক করে দিল তার বাহিনীকে। কুঠিতে সাজ-সাজ রব পড়ল। কিন্তু তার আগেই কুঠির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিশ্বনাথের দলবল। আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত।

দীপালি উৎসবে আতশবাজি ফোটার মত গোলাগুলি বর্ষণ হতে লাগল। ফেডির অনেক অনুচর নিহত হল। যারা বেঁচে রইল তারা ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে পালিয়ে গেল।

ভীত-সন্ত্রস্ত ফেডির স্ত্রী পাশের পুকুরে নেমে গেল। মাথায় কালো হাড়ি চাপিয়ে ডুব-সাঁতারে কোন রকম পালিয়ে বাঁচল।

কিন্তু পালানোর পথ পেল না ফেডি। বিশ্বনাথের অনুচর ও প্রধান সেনাপতি মেঘাই সরদার তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাকে বন্দী করে নিয়ে আসেন বাগদেবী খালের পারে।

সেখানেই হল বিচার। প্রজা-নিপীড়নের অপরাধে ফেডিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

ফেডি দু' হাত জোড় করল। স্বীকার করল তার সব অপরাধ। অস্বীকার করল, এখন থেকে সে ভাল মানুষ হয়ে যাবে। আর জুলুম-অত্যাচার করবে না। শুধু সে তার প্রাণটি ভিক্ষা চায়। যীশুর শপথ, সে আর বাড়াবাড়ি করবে না। এ দফায় তাকে মাফ করে দেয়া হলে সে হামলা-টামলা করবে না। এ ঘটনা সে আদৌ প্রকাশই করবে না।

ফেডির কাকুতি-মিনতিতে নরম হলো বিশ্বনাথের মন। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

খাঁচার পাখি উড়াল দেয়

ফেডি ইংরেজ সাহেব। তার উপর আবার নীলকর। বেঙ্গলি তার রক্তের সাথে মিশে রয়েছে। প্রাণভিক্ষা নিয়ে মুক্তি পাওয়ার পরপরই ফেডি নিজ মূর্তি ধারণ করে। তার প্রথম কাজটিই হল বিশ্বনাথকে ধরিয়ে দেয়া।

বিশ্বনাথকে দিনাজপুর জেলে আটকে রাখা হল। কিন্তু ইংরেজের জেল কতই-বা বড়? বিপ্লবের নেতাকে কি তা ধরে রাখতে পারে?

বিশ্বনাথ জেল থেকে পালিয়ে যান।

এর চারদিন পর। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮০৮ সাল। রাত তিনটায় ফেডির বাসভবন আবার আক্রান্ত হল।

সামনে বিশ্বনাথকে দেখতে পেয়ে ভূত দেখার মত চমকে ওঠে ফেডি। তখন ফেডি ও লেডিয়ার্ড ঘুমিয়ে ছিল। গোলাগুলির শব্দে তার ঘুম ভাঙ্গে। জেগে দেখে, তাদের বাংলা ঘিরে ফেলেছে বিশ্বনাথের সশস্ত্র লোকজন। লেডিয়ার্ড ও তার একজন অনুচর সাথে সাথে বন্দুক হাতে তুলে নেয়। তারা ইতল-বিতল গুলি ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু সে গুলি কাউকে স্পর্শ করতে পারে না।

ইতোমধ্যে বল্লম ছুটে এসে ঘায়েল করে লেডিয়ার্ডকে। লেডিয়ার্ড প্রাণ হারায়। ফেডি আবার বন্দী হয় বিশ্বনাথের হাতে। বিশ্বনাথ ফেডির প্রধান পাইককে হুকুম করে কোষাগার দেখিয়ে দেয়ার জন্য। বিশ্বনাথের লোকজন ফেডি ও তার পাইককে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসে কাছে-ধারের এক মাঠে। এবারও ফেডি হাত জোড় করে। কাকুতি-মিনতি করে জানায়, আর সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এবারের মত মাফ পেলে সে নীলচাষই তুলে নেবে।

এর মধ্যে দিনের আলো ফুটে উঠেছে। বিশ্বনাথ তার দলবল নিয়ে এ জায়গায় আর অবস্থান নিরাপদ বোধ করল না। ফেডিকে করাল করিয়ে এবারও ছেড়ে দেয়া হল। ফেডির টাকা-পয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা চলে গেল।

অশ্বথ গাছের খাঁচায়

বিশে ডাকাতকে ধরতেই হবে। এ কাজ পুলিশের নয়। এবার মাঠে নামল সেনাবাহিনী! সেনাপতি ব্ল্যাকওয়ার।

নীলকরদের এক সহযোগীর বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় বিশ্বনাথের কয়েকজন অনুচর। এর মধ্যে তার পালক পুত্র পঞ্চাননও ছিল। তাকে মোটা অংকের পুরস্কারের লোভ দেখানো হল। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিল পঞ্চানন। সে বিশ্বনাথের গোপন ঘাঁটি ও বাসস্থানের কথা ফাঁস করে দিল।

সাথে সাথে ছুটল সেনাবাহিনী। বিশ্বনাথের গোপন ঘাঁটি কুনিয়ার জঙ্গল অবরোধ করল। বনে জ্বালিয়ে দিল আগুন। এর সাথে প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ।

বিশ্বনাথ বললেন একা আমার জন্যে এতগুলো লোকের জীবন নাশ হবে! না, তা হতে পারে না। বিশ্বনাথকে পেলেই যদি ওরা খুশি হয়, তাহলে আমি ধরা দিচ্ছি। তোমরা সবাই পালিয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকুক বিশ্বনাথ। সারাদেশের সব প্রান্তে নীল সাহেব আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে জ্বালিয়ে দাও বিদ্রোহের আগুন।

বিশ্বনাথ ধরা দিলেন। এ যাবতকালের সব ঘটনার দায়-দায়িত্ব তিনি তুলে নিলেন নিজ কাঁধে।

ফেডির সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকতা ও অপকর্মের জন্য তিনি তাঁকে গালাগাল দিলেন। সেনাপতি ব্ল্যাকওয়ারের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন আমার কোন ঘর নেই। সংসার নেই। নীলকর, জমিদার, মহাজনের জুলুম যেদিন বন্ধ হবে, সেদিনই আমার ঘর হবে, সংসারে ফেরা হবে।

গঙ্গার তীরে প্রকাশ্যে বিশ্বনাথকে ফাঁসি দেয়া হয়। তার মৃদদেহ লোহার খাঁচায় ভরে একটি অশ্বথ গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়। বিশ্বনাথের উন্মাদিনী জননী ডেকে ফিরেন বিশ্বনাথ! ঘরে আয়!

বিশ্বনাথের লাশের চোখদু'টো বুঝি ধিকি-ধিকি জুলে ওঠে।

আলোকদিয়া লড়াই

১৮৫৬ সাল। চুয়াডাঙ্গার পাশেই কানাইনগর নীলকুঠি। কুঠিয়ালের নাম আরভিল সেস। কুঠিয়াল দলবল নিয়ে এসেছে আলোকদিয়া গ্রামে। আরভিল সেস নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে কৃষকদের জমিতে নীলচাষের জমি দাগ দিচ্ছে। কৃষকরা এসে বাধা দিল। জমি তাদের। হাল তাদের। সাহেবের ইচ্ছে মত তাদের জমিতে নীল চাষ করতে পারবে না।

কুঠিয়াল সাহেবের মুখের উপর মূৰ্খ কৃষকদের এত বড় কথা! আরভিল সেসের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। সেস হুকুম দিল তার বাহিনীকে। ব্যাটাদের পিটিয়ে কথা বলার মজাটা বুঝিয়ে দিতে হবে।

কৃষকদের সাথে কুঠিয়াল বাহিনীর লড়াই বেঁধে গেল।

পুরো গ্রামের লোকজন সব একাট্টা এমন হবে ভাবেনি সাহেব। দেখতে না দেখতেই তার লেঠেলরা মাটিতে পড়তে লাগল কাটা গাছের মত।

সাহেব ভয় পেল। কিন্তু পালানোর পথ খুঁজে পেল না। কৃষকদের সম্মিলিত হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হল কুঠিয়াল আরভিল সেস।

কুঠিয়াল হত্যা নিয়ে মামলা হয়। আসামী আলোকদিয়ার কৃষকরা। আসামীদের কয়েকজন পালিয়ে আশ্রয় নিল ফুলবাড়ি ও কোটানি গ্রামে।

ভিন-গাঁয়ে আত্মগোপন করেও তাদের তৎপরতা থেমে রইল না। কুঠিয়াল আর তাদের লেঠেল বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের কাজকর্ম চলতেই লাগল। নীলচাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের মনে তুষের আগুন ধিকধিক জ্বলতে লাগল।

পুলিশের কানে গোপনে কিছু কিছু খবর গিয়ে পৌছতে লাগল। গোপন সূত্র ধরে পুলিশ একদিন হানা দিল ফুলবাড়ি গ্রামে। সেখানে বন্দী হয় কয়েকজন। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন নিমাই মণ্ডলও। তিনি হিসের পাড়ার একজন বিখ্যাত বিদ্রোহী সংগঠক।

এগারপাড়া তরুণের নীল বিদ্রোহী ও কৃষকদের নেতা ছিলেন হিসের পাড়ার জিয়াউল্লাহ বিশ্বাস ওরফে জারি বিশ্বাস। নিমাই মণ্ডল ছিলেন তাঁর সাংগঠনিক কর্মী ও সহযোগী।

ফুলবাড়ি গ্রাম থেকে গ্রেফতারকৃত আসামীদের নিয়ে পুলিশ কালুপোল থানায় এল। ইতোমধ্যে এই গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশের গ্রামে। পুলিশরা বন্দীদের নিয়ে থানায় এসে এক মুহূর্তের জন্যেই শান্তি পেল না। চারপাশে হৈ-হৈ রব। কালুপোল, গোষ্ঠবিহার, বহালগাছি, যাদবপুর, ছয়ঘরিয়া, খাড়াগোদা, তেঘরি, বাটিকাডাঙ্গা—এসব গ্রাম থেকে কৃষক আর নীল বিদ্রোহী যোদ্ধারা আসতে লাগল পিল-পিল করে। থানা ঘেরাও। ভেতরে বন্দীদের নিয়ে আটকা পড়ে গেল পুলিশের দল। নীলচাষী ও কৃষক-যোদ্ধারা অবলীলাক্রমে পুলিশদের হাত থেকে বন্দীদের ছিনিয়ে নিল। দেখতে না দেখতে থানার ঘর-বাড়িও তছনছ হয়ে গেল।

কৃষকদের মধ্যে এক আওয়াজ আর নীল চাষ নয়।

এ জন্যে তারা খাড়াগোদা নীলকুঠির গোলাতেও হামলা চালাল। গোলা থেকে পরিশোধিত ও বাজারজাতের জন্য প্রস্তুত ২৭০ মণ নীল চিত্রানদীতে ফেলে দিল। অবস্থা সঙ্গীন। খবর গিয়ে পৌছল সদরে। যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্কিনার সাহেব। খবর পেয়ে নিজেই ছুটে এল কালুপোলে। ৪৯টি গ্রাম থেকে ডেকে পাঠাল ৪৯ জন গ্রাম-প্রধানকে।

খাড়াগোদা নীলকুঠিতে গ্রাম-প্রধানদের নিয়ে দেন-দরবার। না, নীলচাষ বন্ধ করা যাবে না। নীল চাষ করলেই ঘাড়ের উপর কোন মামলা থাকবে না। কৃষকদের পালিয়ে বেড়াতে হবে না। এখন গ্রাম-প্রধানরা নীলচাষের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেই সব ঝামেলা মিটে যায়।

নানা ছলছুতায় প্রভাবিত হল ৪৫ জন গ্রাম-প্রধান। তারা চোখ বন্ধ করে চুক্তিপত্রে সই করে দিল। কিন্তু বেকঁবে বসল ৪ জন গ্রাম-প্রধান। তাদেরকে শুধু প্রলোভন নয়, ভয়-ভীতিও দেখানো হল। কিন্তু কিছুতেই তাদেরকে টলানো গেল না। তারা কোনভাবেই চুক্তিপত্রে সই দেবে না।

স্কিনার সাহেব রেগে গেল। বলল এই চারজন বেয়াদবকে গ্রেফতার করে যশোরে চালান দাও।

চারজন গ্রাম-প্রধান অবাক হয়ে বলল : আমাদের কি কসুর? জমি আমাদের। হাল আমাদের। আমাদের জমিতে আমরা কি চাষ করব, সে ব্যাপারে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব। আপনার ইচ্ছে মতো নীল চাষ করব না বলেই কি আমাদেরকে যশোরে চালান দিচ্ছেন?

স্কিনার বলল : হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা পালন না করার শাস্তি।

চারজন চমৎকৃত হয়ে ব্যঙ্গ করে বলল : বাহ! চমৎকার আইন!

স্কিনার বলল এটাই ইংরেজদের বিধান। ইংলিশ আইন।

চারজন বলল : ইংলিশ আইন আর জংলী আইন তাহলে একই জিনিস।

স্কিনার রেগে-মেগে পুলিশদের হুকুম করল নিয়ে যাও ওদের।

কিন্তু হুকুম আর প্রতিপালন হয় না। বাইরে মুখিয়ে ছিল জনতা। স্কিনারের হুকুমের কথা তাদের কানে পৌঁছতেই দলে দলে লোক আসতে লাগল।

গ্রাম-প্রধানরা বলল সাহেব, কে কাকে বন্দী করে? এবার তুমিই জনতার হাতে বন্দী।

কৃষকদের হাতে বন্দী হল স্কিনার।

স্কিনার সাহেবকে উদ্ধার করতে ছুটে এল সেনাবাহিনী। তারা ৩৬ জন কৃষককে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আগুনে তেতে উঠল পুরো এলাকা।

মাথার পাগড়ি কোমরে

শ্রীহরি রায় চণ্ডীপুরের জমিদার। একজন শক্তি সাধক। তাঁর মাথায় পাগড়ি। পরনে ধুতি। পায়ে খড়ম। এই ছিল তাঁর পোশাক। ধুতির একটা প্রান্ত দিয়ে সারা শরীর ঢেকে রাখেন।

শ্রীহরি রায়েরও নীলের আবাদ ছিল। ছিল নীলকুঠি। তাঁর ফুলবাড়ি নীলকুঠি জবরদখল করে উইলিয়াম শেরিফ। কুঠি দখল করলেও সে জায়গার জমিদারি শ্রীহরিরই ছিল। তাঁর অনুগত প্রজারা শেরিফের হুকুমের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল অবিরাম।

চারপাশে অবস্থা যখন উত্তপ্ত, তখন শেরিফ শ্রীহরি রায়ের সাথে আপোষ-মীমাংসা করে ফেলার তাগিদ বোধ করল। এজন্যে শ্রীহরি রায়কে আলোচনায় ডেকে আনার জন্য ষোল ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিল।

শেরিফের আস্তানায় খুব সমাদর করে শ্রীহরি রায়কে অভ্যর্থনা জানানো হল।

কিন্তু আলাপ-আলোচনাকালে দেখা গেল শেরিফ তার নীলরক্তের কথা ভুলে যায়নি মোটেও। শাসকের কণ্ঠেই সে বলল আপনার জমিদারির ভেতর আপনারই প্রজারা সন্নাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছে। এ অবস্থায় আপনাকে তো চুপ থাকলে চলবে না। আপনাকে নিজে হস্তক্ষেপ করে এসব বন্ধ করতে হবে। না হলে ব্যাপারটা ছোট লাট পর্যন্ত গড়াবে। এতে আপনার জমিদারিরই ক্ষতি হবে।

শ্রীহরি রায় স্বল্পভাষী। কথা বলেন মেপে মেপে। তিনি বললেন আমি প্রজাদের কাছ থেকে লাটের খাজনা আদায় করে দিই মাত্র। এছাড়া তাদের উপর আমার আর কোন কর্তৃত্ব নেই। কর্তৃত্ব তো আপনারই। তাদের প্রতিদিনকার কাজকর্ম, আচার-আচরণ সব আপনাদের হুকুমেই চলে। ওরা যদি সন্নাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই করে, তাতে আমার করার কি আছে? এজন্যে আমি দায়ী নই।

শ্রীহরি রায়ে এমন জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই। উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেল।

এনায়েতপুরবাসী গোমস্তা নগেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় বলল আপনার ভুল হচ্ছে বাবু।

শ্রীহরি রায় তার দিকে দৃষ্টি রেখে বলল আমার নয়, তোমাদের সাহেবের ভুল হচ্ছে হে।

মাথা গরম হয়ে গেল শেরিফের। সে রেগে-মেগে বলল : তুমি কোথায় বসে কথা বলছ শ্রীহরি, তা কি তোমার মনে রয়েছে?

শ্রীহরি হেসে জবাব দিল : আছে! আছে! আপনারা আমার কাছে কি চান সাহেব?

শেরিফ ধীরকণ্ঠে বলল : ফুলবাড়ি তরফ আমাকে ইজারা দিতে হবে। সেখানকার প্রজাদেরকে শান্ত করতে হবে।

সেখানে উপস্থিত ছিল ম্যাকনেনয়ার সাহেব। সে আদেশের সুরে বলল এখানে বসেই সব করে দিয়ে যেতে হবে। তা যদি না কর, তাহলে তুমি জমিদারি ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোথায় যেতে চাও, সেটাও এখানেই ঠিক করে নাও।

শ্রীহরি বসেছিলেন একটা চৌকির উপর। পদ্মাসনে। তিনি নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললেন আর ক'দিনই-বা আছ ম্যাক, এই সামান্য ক'দিনের জন্য আর ইজারার প্রয়োজন কি?

জবাব শুনে পিণ্ডি জুলে গেল ম্যাকনেয়ারের। সে হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরল শ্রীহরি রায়ের। সাথে সাথে সবাই এগিয়ে এসে ম্যাকনেয়ারকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আলোচনার এখানেই ইতি।

শ্রীহরি রায় উঠে দাঁড়ালেন। মাথা থেকে খুলে ফেললেন তাঁর পাগড়ি। কোমরে বাঁধলেন। গনুগনে আগুনের চোখ নিয়ে তাকালেন শেরিফের দিকে। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন : জেনে রাখ সাহেব, এই আমি শপথ করছি, যেদিন আমি নিজের হাতে এদেশের কুঠিগুলো জ্বালিয়ে দিতে পারব, সেদিনই আমার এই পাগড়ি কোমর থেকে খুলে আবার মাথায় বাঁধব—এর আগে নয়।

তিন জমিদারের জোট

শ্রীহরি রায় শেরিফের সাথে আলোচনা ভেঙে দিয়ে সোজা চলে যান মথুরানাথ আচার্যের বাড়িতে।

মথুরানাথ আচার্য সাধুহাটির জমিদার ও নীল ব্যবসায়ী। ঝিনেদার পূর্বে পথহাটির জমিদার দিকপতি মজুমদার ও সাধুহাটির পাশে পোতাহাটির আন্ততঃ গাঙ্গুলির সাথে তিনি পৃথক পৃথক যৌথ মালিকানায় নীলকুঠি স্থাপন ও নীল-ব্যবসা শুরু করেন। এছাড়া তাঁর নিজের নীলচাষ ও নীলকুঠি ছিল। ম্যানেজার রেখেছিলেন একজন সাহেবকে।

নীলচাষ ও কুঠি স্থাপন নিয়ে তাঁর ও দিকপতি মজুমদারের সাথে ম্যাকনেয়ারের বিবাদ ছিল। এর মধ্যে ম্যাকনেয়ার তাঁদের সাথে খুব দুর্ব্যবহার ও উৎপীড়ন চালিয়েছিল। ইংরেজদের সিন্দুরিয়া ও মথুরানাথের সাধুহাটি নীলকুঠির দূরত্ব বেশি ছিল না। নবগঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে সিন্দুরিয়া কনসার্ন এবং পূর্ব তীরে এনায়েতপুরের মাঠ। এ মাঠের লাগোয়া সাধুহাটির জমিদার বাড়ি ও নীলকুঠি। এই মাঠে মথুরানাথ আচার্যদের ভাল জাতের নীলগাছ উৎপন্ন হয়।

শেরিফ জোর করে এই মাঠটি দখল করে নেয়। এটাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে রূপান্তরিত করে। এ মাঠে ঘোড়াদের ছুটোছুটি আর সাহেবদের উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ আচার্যদের বিস্কন্ধ করে তোলে।

অন্যদিকে ইংরেজ কনসার্নের পাশেই দেশি বাবুর কুঠি সাহেবদেরও মাথা-ব্যথার কারণ। এই নিয়ে উভয় পক্ষেরই ছিল চাপা ক্ষোভ। প্রথমদিকে এ নিয়ে দুই পক্ষের পাইক-পেয়াদাদের বাদানুবাদ ঝগড়াঝাটি হত। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটি ক্রমে ক্রমে হানাহানির পর্যায়ে গিয়ে পৌছে।

পথহাটির জমিদার দিকপতি মজুমদারও সাহেবদের উপর চটা ছিলেন। তাঁর বড় ভাই গণপতি মজুমদারও শ্রীহরি রায়ের মতই ইংরেজদের অপমানের শিকার হন। পোড়াহাটি মৌজার দখল ও সেখানে নীলকুঠি স্থাপনের ব্যাপার নিয়ে শেরিফ গণপতি মজুমদারকেও সিন্দুরিয়া নীলকুঠিতে ডেকে আনেন। আলোচনা চলে চরম উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে। এক পর্যায়ে ম্যাকনেয়ার গণপতির প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। গণপতি উত্তেজিত হয়ে মুঠো পাকিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন ম্যাকনেয়ারের উপর। এই অপরাধে গণপতিকে বন্দী করা হয় এবং মলমুত্র ভর্তি এক কামরায় বারোদিন অভুক্ত অবস্থায় আটকে রাখা হয়। পরে পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয়।

এরপর শ্রীহরি রায়ের ঘটনা। শ্রীহরি রায় এদেরকে জিজ্ঞেস করেন : আমরাও তো নীলচাষের নামে কৃষকদের সর্বনাশ করছি। আর কতকাল ফিরিঙ্গিদের মত আমরাও দেশের লোকদের সর্বনাশ করব?

তিন জমিদার ইংরেজ সাহেবদের বিরুদ্ধে জোট করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, সংগ্রামী কৃষক-জনতাকে এ কাজে ব্যবহার করতে হবে। এ জন্যে তাঁদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন। কথা বলার আয়োজন শুরু হল। পোতাহাটির নেপাল বিশ্বাসের বাড়িতে এক মজলিশের আয়োজন করা হল। দাওয়াত দেয়া হল সংগ্রামী কৃষক-যোদ্ধাদের। কৌশলে তাদেরকে এ মজলিশে সমবেত করার ব্যবস্থা করা হল।

খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হওয়ার পর শুরু হল আলাপ-আলোচনা। জমিদার তিন জনের পক্ষ থেকে সংগ্রামী কৃষকদের আশ্বাস দেয়া হল: জমিদাররা তাদের আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করেন। এজন্যে সবধরনের সাহায্য-সহযোগিতা তাঁরা দেবেন। আর কৃষকরা যদি সিন্দুরিয়া নীলকুঠি আক্রমণ করে তাহলে তাদের সাহায্য করার জন্য জমিদাররা তাঁদের লেঠেল বাহিনী পাঠিয়ে দেবেন এবং এর পুরো দায়-দায়িত্ব তাঁরা বহন করবেন। কৃষকরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাল। চোখে চোখে তাদের পরামর্শ করা হয়ে গেল। তারা জানাল জমিদার বাবুরা সাহায্যের জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন, এজন্যে তাঁদেরকে ধন্যবাদ। তবে তাঁদের কোন সাহায্য যোদ্ধারা নেবে না। কৃষকদের পরিষ্কার দাবি, জমিদারদেরকে নীলচাষ তুলে দিয়ে নীলকুঠিগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। এছাড়া তাদের কাছ থেকে আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

পতিত ঘোড়ায় নীল গোলাম

কুতুবপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে অপেক্ষা করছে এক দল যুবক। তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র। ম্যাকনেয়ার আসছে। ঘোনদাড়ি থেকে এ পথে আসছে সিন্দুরিয়ায়। পাক্সা খবর। কুঠির কর্মচারীদের নিকট থেকে গোপন খবর পৌঁছেছে ওয়াসিম বিশ্বাসের কাছে। ম্যাকনেয়ারের একটা ব্যবস্থা করার জন্য ওয়াসিম বিশ্বাস এই যুবক দলকে পাঠিয়েছেন এখানে।

ম্যাকনেয়ারের পাপের গ্রাস কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার অপরাধের শেষ নেই। এবার এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। যুবকদের চোখে জুলে ওঠে প্রতিশোধের আগুন।

এই তো কিছুদিন আগেও একজনকে পিটিয়ে খুন করছে কুঠিয়ালের পাইক-পেয়াদারা। মথুরানাথের প্রজা কালু মণ্ডল। যাচ্ছিল সিন্দুরিয়া। যাওয়ার পথেই পড়ে সিন্দুরিয়া। শেরিফের পেয়াদারা ধরে ফেলল কালু মণ্ডলকে। তারা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

গ্রামের লোকরা উদ্ধার করল কালু মণ্ডলের লাশ। সুবিদ মণ্ডলের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ জনতা তার লাশ খাটিয়ায় নিয়ে ৫০-৬০টি গ্রাম ঘুরে বেড়াল। কালু মণ্ডলের লাশ যে-ই দেখে তার ভেতরেই শেরিফের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণার আগুন জ্বলে ওঠে দাউ-দাউ করে।

বিক্ষুব্ধ প্রজারা এসে ধর্না দিল জমিদার মথুরানাথ আচার্যের কাছে। তারা এর একটা বিহিত করতে মথুরানাথকে বারবার অনুরোধ করল। কুতুবপুর গ্রামের ওয়াসিম বিশ্বাসের সাথে মথুরানাথের ভাব ছিল। তাঁর সাথেই পরামর্শ করলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ঘোনদাড়ি যাওয়ার পথে ম্যাকনেয়ারকে ধরে খুন করা হবে।

উইলিয়াম শেরিফের কানে গিয়ে পৌঁছল এ খবর। ঘোনদাড়ি কুঠির প্রজারা বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তখন জুলাই মাস। ১৮৫৯ সাল।

ঘোনদাড়ি প্রজাদের বিদ্রোহ থামাতে উইলিয়াম শেরিফ তার ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার ও সহকারী নলিনাক্ষ মিত্রকে নিয়ে সেখানে গেল। বৃষ্টি-বাদলের দিন। প্রবল বৃষ্টিতে শেরিফ পালকি চড়ে সিন্দুরিয়ায় ফিরে এল। রয়ে গেল ম্যাকনেয়ার ও নলিনাক্ষ।

দু'দিন পর শেরিফ খবর পাঠাল, শেরিফের ঘোড়া 'নীল ঘোড়া' নিয়ে ম্যাকনেয়ার যেন ফিরে আসে সিন্দুরিয়া।

এই পাকা খবর ওয়াসিম বিশ্বাসের কানে পৌঁছতেই তিনি জেহাদ-উন্নাখ যুবকদেরকে পাঠিয়ে দিলেন কুতুবপুর গ্রামের পশ্চিম মাঠে—সিন্দুরিয়ায় যাওয়ার রাস্তা পাহারা দিতে।

যুবকরা সারাদিন সেখানে অপেক্ষা করল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ম্যাকনেয়ারের পাত্তা নেই। যুবকরা ভাবল, শিকার আর আসবে না। এখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

ওরা যখন ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনি ভেসে আসল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। সচকিত হয়ে উঠল যুবক দল। লটি পুকুরের উত্তরে রাস্তার দু'পাশে শেওড়া গাছের সাথে বাঁধা মোটা ও শক্ত দড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহী সেখানে পৌঁছে গেল। যুবকরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে খুবধনি। হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ। ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারি দড়িতে ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড়

করে উল্টে পড়েছে। যুবক দল পতনের আওয়াজ শুনল। তারা বর্শা হাতে রে-রে-করে ছুটে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল অশ্বারোহীর উপর। আহত অশ্বারোহী আত্ননাদ করে উঠল : হা ভগবান।

যুবকরা থমকে দাঁড়াল। সাথে সাথেই জ্বালানো হল আলো। ওরা দেখল, ম্যাকনেয়ার নয়, নিচে আহত হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে নলিনাক্ষ মিত্র।

যুবকরা বলল : যাহ! এ দফায় ম্যাকনেয়ার বেঁচে গেল। এই ব্যাটা নীল সাহেবের গোলাম, তোর সাহেবকে বলে দিস, তাকে পেলে আমরা মারব না পিটাব না—জ্যাস্ত কবর দেব।

যুবক দল ঘোড়ায় সে স্থান ত্যাগ করল। নলিনাক্ষ একা সেখানে পড়ে নিজের নিয়তিকে দিক্কার দিতে লাগল।

ময়ূরপঙ্ক্তীর বীর ও বীরঙ্গনা

মথুরানাথের ছেলে অমরনাথ। বৌ আরতি দেবীকে নিয়ে পূজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন বোয়ানিয়ায়। জমিদার বাড়ির ঐতিহ্যবাহী ময়ূরপঙ্ক্তীতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। নৌকার মাঝি হল তারিনী আর রোহিনী পাটনি—দুই ভাই। দেহরক্ষী ছিল শঙ্খ সর্দার আর হাজারী সর্দার।

রাত তখন সাড়ে দশটা। নৌকা এসে পৌঁছেছে কুঠির ঘাটে। ম্যাকনেয়ারের কাছে খবর পৌঁছল মথুরানাথের ছেলে আর ছেলে-বৌ নৌকায় করে যাচ্ছে।

ম্যাকনেয়ারের চোখ দিক-দিক করে জ্বলে উঠল। প্রতিশোধ নেয়ার এই এক উপযুক্ত সময়।

ম্যাকনেয়ারের মনে রয়েছে, কুতুবপুরে নলিনাক্ষ মিত্রের জখম হওয়ার ঘটনা। আসলে লক্ষ্য ছিল সে নিজেই। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সে। সেদিনের ঘটনার পরই ওয়াসিম বিশ্বাস বিহারে পালিয়ে চলে যান। অনেকদিন পর আবার ফিরে আসেন। কুতুবপুরের লোক তাঁর নাম বদলে দেয়। ওয়াসিম বিশ্বাস হয়ে যায় আশরাফ বিশ্বাস। পুরো গ্রামের লোকেরা সাক্ষ্য দেয়, তাদের গ্রামে ওয়াসিম বিশ্বাস নামে কোন লোক নেই, ছিলও না।

উইলিয়াম শেরিফ ধুরন্দর লোক। পাত্তা লাগিয়ে মূল ষড়যন্ত্রের নাড়ি-নক্ষত্র সবই বের করে। সে ঘটনার পেছনে ছিলেন মথুরানাথ আচার্য। এটা বুঝতে তার বাকী থাকে না। শেরিফ জর্জ ম্যাকনেয়ারকে ডেকে খুব বকাবকি করেছিল। তারপর হুকুম দিয়েছিল, যে কোন মূল্যে এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

আজ এসেছে প্রতিশোধ নেয়ার মওক। ম্যাকনেয়ারের আদেশে তার কুঠিয়াল ও বরকন্দাজ বাহিনী ময়ূরপঙ্ক্তী আটক করে বেড়াই গ্রামের নিচে নদীর চরে।

জমিদার পুত্র অমরনাথ ও মাঝি বাহিনী টের পেয়েই নৌকার খিড়কি পথ দিয়ে বেরিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

আরতি দেবী টের পান, নৌকা কুঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত। তিনি হংকার দিয়ে উঠলেন : ভয় কি শঙ্কু-হাজারী! লাঠি চালাও।

কিন্তু শঙ্কু ভয়ে থরথর কাঁপছে। সে জাপটে ধরল ম্যাকনেয়ারের পা। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল : হুজুর মা-বাপ! দোহাই বাবা! আমাকে কিছু করবেন না। আমাকে ছেড়ে দিন। নইলে আমার বৌ-ছেলে ভেসে যাবে।

ম্যাকনেয়ার মুচকি হেসে শঙ্কুকে ছেড়ে দিল।

আরতি দেবীর আদেশ শুনতে পেয়েছিল হাজারী সর্দার। তার সাহসও অপরিসীম। সে ভয়-শংকাহীনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঠিয়াল বাহিনীর উপর। ম্যাকনেয়ারকে লক্ষ্য করে লাঠি চালায়। অস্ত্রের জন্য ম্যাকনেয়ারের মাথা বেঁচে যায়। শুরু হয় তুমুল লড়াই।

হাজারী সর্দারের লাঠির ঘায়ে প্রাণ হারায় কুঠিয়ালের দুই লেঠেল—গাজন ও সোজন। যুদ্ধ করতে করতেই জীবন বিসর্জন দেয় হাজারী সর্দার। ম্যাকনেয়ার এসে ধরে আরতি দেবীর শাড়ির আঁচল।

আরতি দেবী ঘৃণা ভরে তাকালেন ম্যাকনেয়ারের দিকে। অভিশাপ দিয়ে বললেন : এই পাপের আগুনে যেন সবংশে পুড়ে মরিস।

পরদিন ভোরবেলা। আরতি দেবীর মৃতদেহ পাওয়া যায় কুঠির ঘাটের পূর্ব তীরে সাধুহাটি যাবার রাস্তার পাশে তারিনী পাটনীর বাড়ির কাছে। বটতলায় বেত বনের মধ্যে।

মথুরানাথ আচার্যকে লোকজন এসে খবর দিল, ওখানে একটা লাশ পড়ে আছে। মেয়ে লোকের। মেয়ে লোকটি কি আপনাদের বাড়ির বৌ? মথুরানাথ হ্যাঁ-না কিছুই বলেন না। তাঁর চোখে বারুদ জমে। তিনি নীল চাম আর নীল ব্যবসা ত্যাগ করেন। কৃষকদের বিদ্রোহের সাথে একাত্ম ঘোষণা করেন। তাঁর চোখের বারুদে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে।

রইস খান

রইস খান। নীলকর উইলিয়াম শেরিফের প্রধান সহিস। আসলে ছদ্মবেশী হামকল যোদ্ধা। নীলকুঠিতে এসে ঢুকেছেন। যোগসূত্রটি রয়েছে বিপ্লবী কৃষকদের সাথে।

সাহেব তো আর অতসব খবর রাখে না। রইস খানের উপর সে খুব খুশী। এমন সাহস, শক্তি আর নিষ্ঠা তার কুঠিতে খুব কমজনেরই রয়েছে। সাহেবের প্রিয় হলেও

তাকে কিন্তু দেখতে পারে না কুঠির গোমস্তা-দালালরা। ম্যানেজার জর্জ ম্যাকনেয়ার আর দেওয়ান নলিনাক্ষ মিত্র তাঁকে দূঁচোখে দেখতে পারত না।

এতে কোন পরোয়া নেই রইস খানের। তিনি দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার। তেমনি দূরন্ত ঘোড়াকে বশ মানাতেও তাঁর জুড়ি নেই। এ জন্যেই তিনি শেরিফ সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

নীলকুঠিতে চাকরি করলেও তাঁর কথাবার্তা চাঁচাছোলা। যে কারো মুখের উপর হক কথা বলতে তাঁর বুক কাঁপত না এক তিলও। কোথাও কোন অন্যায় দেখলে সাথে সাথে প্রতিবাদ জানাতেন। অন্যায়ের কোন প্রতিকার না হলে সাথে সাথে ছুটতেন শেরিফের কাছে। তাই কুঠির সবাই সমীহ করে চলত তাঁকে। খানিকটা ভয়ও পেত।

সতীত্ব হরণ জাতপাত নেই

সন্ধ্যা। রইস খান আস্তাবলের দিকে যাচ্ছিলেন। ঘোড়াগুলো দেখ-ভাল করা দরকার। আস্তাবলে যাওয়ার পথে কাছারি পড়ে। কাছারিতে গোমস্তা নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কক্ষ। তার পাশ দিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়াতে হল রইস খানকে। গোমস্তার কক্ষ থেকে চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

রইস খান উঠে এলেন কাছারিতে। কক্ষের কাছে আসতেই ভয়ার্ত নারীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল কেগো? কে বাবা তুমি? আমাকে বাঁচাও।

রইস খান এসে দাঁড়ালেন কক্ষের সামনে। দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে তাল দেয়া। দেখতে পেলেন জানালাটি খোলা। সেই জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। চোখে টলটলে পানি। ভয়ের চোটে মুখ শুকিয়ে কাঠ। বিপর্যস্ত চেহারা। রইস খানকে দেখেই সে হামলে কেঁদে উঠল।

রইস খান এসে দাঁড়ালেন জানালার পাশে। আন্তরিক সহানুভূতি জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করলেন কেগো মা? কে তুমি? এখানে এলে কি করে?

রইস খানের মুখে মা ডাক শুনে মেয়েটি আরো আকুল হয়ে উঠল। কান্নার উচ্ছ্বাস তার ছাপিয়ে গেল পুরো মুখমণ্ডল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল : আমার নাম সত্যবতী। আমার বাপের বাড়ি গোপালপুর। বাবার নাম হরিপদ রায়। স্বামী ননী গোপাল। স্বশ্রবাড়ি হলো পাইকপাড়া।

সত্যবতী জানাল, সে তার স্বামীর সাথে স্বশ্রবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাচ্ছিল। বিকালবেলার খানিক আগে তারা কুঠির ঘাটে এসে পৌছায়। এসময় কুঠির লোকজন এসে তাদেরকে ঘিরে ধরে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের বাড়িতে সাহেবের ঘোড়ার জিন পাওয়া গেছে। এই মিথ্যে অভিযোগে তাদেরকে এখানে ধরে আনা হয়।

নির্দয়ের মত বেদম পিটানো হয়। তারপর থেকে সে এখানে এই ঘরে আটক। তার স্বামীকে কোথায় কোন্ ঘরে আটকে রাখা হয়েছে জানা নেই। বেঁচেই আছে, নাকি মরে গেছে, না ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কিছুই জানে না সে।

সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রইস খান। পুরো ব্যাপারটাই তাঁর বোঝা হয়ে গিয়েছে। এ ধরনের ঘটনা এখানে আকছারই ঘটছে। কত অসহায় মেয়ের করুণ আর্তনাদে এই কাছারি বাড়িতে রোল উঠছে, এর পাথর মেঝে কত মেয়ের চোখের পানিতে ভিজ়ে উঠেছে—তার হিসাব কে আর রাখতে গিয়েছে। এ ধরনের কিছু ঘটনা রইস খান নিজ চোখে দেখেছেন, আর শুনেছেন বিস্তর। শুনে শুনে এই কাছারি বাড়ির উপর ঘেন্না ধরে গিয়েছে। কিন্তু রইস খান এসব ব্যাপার নিয়ে কখনোই মুখ খোলেননি। আজ সত্যবতীর কথা ও কান্না তাঁর হৃদয়টাকে গুমরে তুলেছে। এভাবে আর চলে না। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।—ভাবলেন তিনি।

কুঠির গোমস্তা নগেন্দ্রনাথ তখন একটা কুলগাছের নিচে আরাম কেদারায় বসে আরাম করছিল। নগেনবাবু তার কর্মজীবনে কুঠির হয়ে প্রজাদের উপর অনেক জুলুম করেছে, উপরি কামাই করে বিত্ত বানিয়েছে। কিন্তু তাই বলে তার কোন ধরনের নারী কেলেকারী নেই—এ ব্যাপারে সে সাধু-সাত্বিক।

রইস খান এসে দাঁড়ালেন নগেনবাবুর সামনে। ডাকলেন বড় বাবু!

বড় বাবু তখন চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছিল। ডাক শুনে চোখ মেলে তাকাল। সামনে রইস খানকে দেখে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার? কি চাও রইস?

রইস খান বিনয়ের সাথে অনুনয়ের স্বরে বললেন বাবু, আপনার কামরায় দেখলাম একটা মেয়ে আটকে রাখা হয়েছে। তাকে তো ছেড়ে দিতে হবে বাবু।

রইস খানের কথা শুনে নগেন বাবুর জ্র কুঁচকে গেল। সে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে এক লহমায় রইস খানকে জরিপ করে নিল। শান্ত কণ্ঠে বলল রইস, আমি তোমাকে খারাপ ভাবি না। কিন্তু তোমার তো জানা, আমার হাত-পা বাঁধা। ইচ্ছে থাকলেও আমি কিছু করতে পারিনে।

রইস খান অস্থির হয়ে কাতর স্বরে বললেন বেশ। আপনি নিজ হাতে কিছু করতে না চাইলে ঘরের চাবিটা আমাকে দিন। আমিই ছেড়ে দিই। হাজার হলেও হিন্দু ঘরের বৌ।

নগেন বাবু মনে মনে ভাবল, লম্পটের কাছে আবার হিন্দু-মুসলিম জাতপাত। সবি ওদের খাদ্য। কিন্তু এই সহিসটি বলে কি? সাহেব বাবুদের খাদ্য সে কেড়ে নেবে? স্পর্ধা তো কম নয়। রইস খানের দিকে সে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল। খানিকপর শান্ত কণ্ঠে বলল : এমন কয়েদখানার চাবি আমি কখনোই কি নিজের কাছে রেখে দিতে পারি? ছিঃ ছিঃ!

রইস খান মুখ তুলে তাকালেন। হতাশ কণ্ঠে বললেন মেয়েটির কি বাঁচার কোন রাস্তাই নেই?

নগেন বাবু একটু ভেবে নিয়ে বলল : তুমি বরং হারান বাবুর কাছে যাও ।

হারান বাবুর আসল নাম নরেন্দ্রনাথ সাধু খাঁ । বাড়ি সনাতনপুর গ্রাম । ম্যাকনেয়ার আর নলিনাক্ষের খুব পেয়ারের লোক । তার বিশ্বস্ত সহকারিনী গবরা পাড়ার সুন্দরী রাধামনি—গোমস্তা মহলের আয়া । এই দু'জনে মিলে কুঠির সাহেব, বাবুদের আনন্দের জন্য মেয়ে জোগাড় করে । তারা গাঁয়ে গাঁয়ে যায় । এটা-ওটা বলে মেয়েদের ফুসলায় । চাকরি-বাকরি আয়-উপার্জনের লোভ দেখায় । কোন কিছুতে ভুলিয়ে-ভালিয়ে না আনতে পারলে জোর-জারি খাটায় । এইভাবে মেয়েদেরকে নিয়ে আসে । কাজকর্ম সারা হলে উচ্ছিষ্টের মত ব্যবহৃত মেয়েদেরকে ঠেলে দেয়া হয় মৃত্যুকূপে ।

হারান বাবু তখন ম্যাকনেয়ার সাহেবের সাথে গোপন শলা-পরামর্শে ব্যস্ত । এসময় রইস খান এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে । তাঁর ডাকাডাকিতে হারান বাবু বেরিয়ে এল । বিরক্ত কণ্ঠে বলল : কি হয়েছে? কি চাই তোমার?

রইস খান আকুতি জানিয়ে বললেন বাবু, আপনার কাছে কখনো কিছু চাইনি । আজ চাইতে এসেছি । এই আপনার সামনে হাত পেতেছি । যদি মেহেরবানী করেন তো আবেদন জানাই ।

হারান বাবুর ভুরু কুঁচকে গেল । তেঁতো গলায় বলল ব্যাটা, খুব সেয়ানা হয়েছে তুমি । আগে-বাগেই কড়াল করিয়ে নিতে চাইছ । কাউকে দয়া দেখানোর জন্য এখানে চাকরি করছি না । তোমার ইচ্ছে হলে বলতে পার কি চাই তোমার । কথা রাখা না রাখা আমার ব্যাপার ।

রইস খান মাটির দিকে মাথা নুইয়ে সজল কণ্ঠে বললেন বাবু, কাছারি বাড়িতে বড় বাবুর ঘরে যে মা-মণিকে আটকে রেখেছেন, দয়া করে তাকে ছেড়ে দিন ।

রইস খানের কথা শুনে বাবুর চোখ চড়কগাছ । ক্রোধে চোখ তার জ্বলে উঠল । প্রচণ্ড রাগে তার শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল । চিৎকার করে বলল ছোট মুখে বড় কথা! এটা তোর আস্তাবল পেয়েছিস? আমাদেরকে ঘোড়া ঠাউরেছিস?

হারান বাবু সাথে সাথে ঢুকে গেল ঘরে । পরক্ষণেই বেরিয়ে এল ম্যাকনেয়ারের চামড়ার তৈরি হান্টারটি নিয়ে । সেটা দিয়ে সক্রোধে এলোপাথাড়ি পিটাতে লাগল রইস খানকে । তাঁর সারা শরীর হান্টারের ঘায়ে রক্তে রক্তময় হয়ে উঠল ।

হান্টারের মারের মুখে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও রইস খান কাকুতি-মিনতি জানিয়ে বলতে লাগলেন আমাকে মারুন । কিন্তু খোদার দোহাই, আপনি মা মণিকে ছেড়ে দিন । তার ইজ্জত নষ্ট করবেন না ।

বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি । ঘটনার সময় কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিল ম্যাকনেয়ার । হারান বাবুকে উৎসাহিত করছিল এ জন্য । রইস খান যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তখন সে তার মুখে লাথি মেরে উল্লাস প্রকাশ করেছিল । এতে তাঁর নাক খেতলে যায় । রইস খানের জ্ঞান ফেরে পরদিন সকালে । চোখ মেলে তাকিয়ে তিনি করুণ কণ্ঠে ডেকে ওঠেন : মা মাগো!

সর্বাঙ্গিক যুদ্ধ

মর্ত্তজাপুর গ্রামের কয়েকজন গাড়েয়ান। ধানের নাড়া যোগাড়-যত্তর করে গাড়ি নিয়ে ফিরছিল। শিবপুর পৌছতেই নীলকুঠির পেয়াদারা তাদেরকে থামায়। নাড়ার গাড়ি জোর করে কুঠিতে নেয়ার উদ্যোগ আয়োজন করে। বাধা দেয় গাড়েয়ানরা।

শুরু হয় গাড়েয়ান ও নীল পেয়াদাদের মধ্যে সংঘাত। এতে কয়েকজন গাড়েয়ান মারা যায়। নীল-পেয়াদারা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর ফলে গরুসহ দু'টি গাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এ ঘটনার কথা বাতাসের চাইতেও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে এলাকার সর্বত্র। আগুন জ্বলে ওঠে সব কৃষক-যোদ্ধার মনে।

২৩ জানুয়ারি। ভোর বেলা। আর কোন ঘোষণা নয়। আর কোন কর্মসূচী নয়। বিপ্লবীদের একটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল নীলকুঠির উৎখাত। বিলেতি সাহেবদের দেশ থেকে বের করে দিতে হবে। একই সাথে বিদেয় করতে হবে দেশ-ঘাতক চামচাদেরকে। চারিদিকে ধিকিধিকি আগুন এক সাথে প্রবল অগ্নিকুণ্ড হয়ে জ্বলে ওঠে। শুরু হয় অভ্যুত্থান। সর্বাঙ্গিক আক্রমণ। মিছিলের পর মিছিল। গৈ-গ্রাম থেকে মিছিলে মিছিলে লোকজন এসে আছড়ে পড়তে থাকে। ক্ষোভ ও ক্রোধে তারা একেকজন আগুনের কুণ্ড। রাতের অন্ধকার মুছে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই চারপাশের গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে আসে। দুপুরের মধ্যে সিন্দুরিয়া নীলকুঠি তারা ঘিরে ফেলে। আর এদিকে জোড়াগত ও ঘোলদাড়িতে যাওয়ার পথ আগলে রাখে সৈয়দ সদরউদ্দিন ওরফে রইস খান ও শ্রীহরি রায়ের বাহিনী। কুঠির সাথে বাইরের জগতের সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ।

শ্রীহরি রায় নিজের হাতে কুঠির গোলাবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর তার পাগড়ি কোমর থেকে খুলে মাথায় বাঁধলেন। এতদিনে তাঁর শপথ পূর্ণ হল। শ্রীহরি রায় সাহেবদের সাথে একদিন কথা কাটাকাটির সময় এই পাগড়ি মাথা থেকে খুলে কোমরে বেঁধে বলেছিলেন, যেদিন নিজ হাতে এ দেশের কুঠিগুলো জ্বালিয়ে দিতে পারব, সেদিনই পাগড়ি মাথায় বাঁধব, নইলে নয়।

কুঠির সব সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। কৃষক-যোদ্ধারাও শত শত মণ নীল নদীতে ফেলে দেয়। কুঠির বাড়িঘর তছনছ করে ফেলে।

প্রথম দিকে দারোগা দুর্গাদাস লাহিড়ীর পুলিশ দল ও কুঠির লেঠেল বাহিনী বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু কৃষকদের সাথে খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা পালিয়ে যায়।

কৃষক-যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে ম্যানেজার ম্যাকনেয়ার। তাকে খুব করে পেটানো হয়। তারপর একটা গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়। আশপাশের যতগুলো কুঠি ছিল তাদের সবগুলোর কর্মচারীদের বাড়িঘর ও সহায়-সম্পদ লুণ্ঠ করা হয়। নীল

গোলাম নরেন্দ্রনাথ ও মেয়ে সরবরাহকারী রাধামনির নাক-কান কাটা হয় এবং তাদেরকে কুঠি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

ঘটনার তৃতীয় দিন। রইস খান তাঁর বাহিনী নিয়ে গিয়েছেন ঘোলদাড়ি। গোপনে খবর গেল উইলিয়াম শেরিফের কাছে। ম্যাকনেয়ার আর কুঠির জন্য মনটা টাটাচ্ছে শেরিফের। রাতের অন্ধকারে একদল পুলিশ নিয়ে সে উপস্থিত হল কুঠিতে। ম্যাকনেয়ারকে উদ্ধার করতে। এগারপাড়ার কৃষক-যোদ্ধারা টের পেয়ে গেল ব্যাপারটা। তারা ছুটে এল। ঘিরে ফেলল পুলিশ বাহিনীকে। ঢাল সড়কি নিয়ে হামলা চালাল তাদের উপর। কৃষক যোদ্ধারা অবলীলাক্রমে তাদের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল এবং তাদেরকে বন্দী করে ফেলল।

শেরিফ ও ম্যাকনেয়ার অবস্থা বেগতিক বুঝে আর কালবিলম্ব না করে সেখানে থেকে সটকে পড়ল সবার অগোচরে। কুঠির ঘাটে বাঁধা জমিদার মথুরানাথের নৌকা চুরি করে পালানোর পথ খুঁজল। জমিদারের চাচা কশিনাথ আচার্যের হাত-পায়ে ধরে জমিদার বাড়িতে এসে জীবন বাঁচানোর আবেদন জানাল।

কিন্তু পেছনে পড়ে রইল ম্যাকনেয়ারের মেয়ে ইভা। ঘটনাস্থলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে সে মারা যায়।

জুলুমের শোভাযাত্রায়

একদিকে নীল চাষীরা সংগঠিত হচ্ছে। অন্যদিকে কুঠিয়ালরা।

ধূর্ত নীলকররা চাষীদের জাগরণ বানচাল করতে নানা ফন্দি-ফিকির ও জুলুমের আশ্রয় নেয়। উইলিয়াম শেরিফ দুই হাজার কৃষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আসামী করে একই সাথে ফৌজদারী ও দেওয়ানি মামলা দায়ের করে। সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্যকে এক নাশ্বার আসামী করা হয়।

এদিকে বেড়ে যায় পুলিশের আনাগোনা। খামোখা হয়রানি আর জুলুম। এই উৎপাতে সিন্দুরিয়ার শক্ত-সামর্থ্য কর্মক্ষম পুরুষরা ঘরবাড়ি ছেড়ে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। মথুরানাথ আচার্যও কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেন।

মওকা পেয়ে যায় কুঠির লোকজন। শুরু হয় তাদের পাইকারী লুটপাট ও জুলুম-নির্যাতন। দুর্গাদাস লাহিড়ী পুলিশের হাবিলদার। সিন্দুরিয়া নীল কুঠিতে সে ফাঁড়ি স্থাপন করে। সেখানে থেকেই সে কায়ম করে ত্রাসের রাজত্ব। গ্রামীবাসীদের থেকে নগদানগদি পয়সাকড়ি আদায় করেও তার শাস্তি হয় না। গরু-ছাগল পর্যন্ত লুটে এনে কলকাতায় তার বাড়িতে পাচার করে দেয়। কিষাণ মেয়ে ও গৃহবধূদের গহনাগাটি লোপাট করতেও তার কোন সংকোচ নেই।

বিচিত্র জুলুমের শিকার হয় আশপাশের সব ক'টি গ্রাম।

কার্পাসডাক্তার তিনজন অবাধ্য প্রজার পাছায় কক্ষে পুড়িয়ে ছাঁক দিয়ে ক্ষত তৈরি করা হয়।

গোপালপুরে একজনের কান কেটে সেই কাটা কান আবার ধরিয়ে দেয় তার হাতে। এরপর তাকে কান হাতে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

তেমনি গ্রামের একজন বিধবার স্ত্রীলতাহানির পর তাকে খুন করা হয়। হিসেরপাড়া গ্রামের সুবেদ আলী বিশ্বাসের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়। এসব কাজে হাবিলদার দুর্গাদাস লাহিড়ীর প্রচণ্ড উৎসাহ। প্রতিদিন সে এ কাজে বেরোয়।

এমনি একদিন সে বেরিয়েছে লক্ষ্মীপুর গ্রামে। মেয়েমানুষ দেখলেই তার রোখ চেপে যায়। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না। মেয়েদের উপর নির্যাতন করতে এগিয়ে গেলেই তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল তার বাহিনীর দু'জন সেপাই আমিন উদ্দিন ও মঈনউদ্দিন।

তাদের সাফ কথা : নিরীহ কৃষকদের পিটিয়ে, লুটপাট করে এর মধ্যেই মেলা গুনাহ হয়ে গেছে, তার উপর আবার মা-বোনদের গায়ে হাত দেয়া কেন? আর যাই হোক, তারা দু'জনে এখানে থাকা পর্যন্ত এ কাজ হতে পারে না।

গুনেই সগর্জনে লাফিয়ে উঠল দুর্গাদাস। কিন্তু সেপাই দু'জন অটল। ওরা বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে বলল: নিকুচি করি তোর পুলিশের চাকরি।

দু'জনে মিলে উত্তম-মধ্যম দিল দুর্গাদাসকে।

তাকে জখম করে তারা পুলিশ বাহিনী ছেড়ে সরে এল।

তাদের গন্তব্য পদ্মবিলা। সেখানে যুদ্ধ-মহড়ার আয়োজন চলছে।

রইস খানের যুদ্ধের মহড়া

যুদ্ধ মহড়ার আয়োজন করেছেন রইস খান। ওরফে সৈয়দ সদরুদ্দিন। উইলিয়াম শেরিফের কুঠি-ভ্যাগী সহিস। ছদ্মবেশী হামকল যোদ্ধা। চারদিকে যখন নীল কুঠির সাহেব, কর্মচারী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক পুলিশ বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতন ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, ঠিক তখনই রইস খানের আবির্ভাব। তাঁর সাথে দশ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী। চাঁদুড়ে, তিতুদহ, বাজিরহাট ও মাদারীপুর থেকে এসেছে এই যোদ্ধারা। তাঁরা চুয়াডাঙ্গার পূর্বদিকে পদ্মবিলা বাজারে ঘাঁটি গাড়লেন। তিন রাত ধরে ঢোল-সহরৎ বাজান। এর সাথে সাথে ঘোষণা আগামী ২২ জানুয়ারী পদ্মবিলা বাজারের পাশে মাঠে যুদ্ধ মহড়া হবে। বিপ্লবী ও কৃষক যোদ্ধা, যারা আত্মগোপন করে রয়েছেন, তাঁরা যেন এ মহড়ায় অংশ নেন।

চারপাশে সাড়া পড়ে গেল। সাজ-সাজ রব। ২০ জানুয়ারি মধ্যে সেখানে এসে সমবেত হয় ষাট হাজারেরও বেশি লোক।

এ খবরে চমৎকৃত হন বিলেতি মিশনারিরাও। হলক্ৰকের নেতৃত্বে হয় মিশনারি এলেন সেই দার্জিলিং থেকে। তাঁরা যুদ্ধ মহড়ায় অংশ নেবেন।

পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে এল দুই সেপাই—আমিন উদ্দিন ও মইন উদ্দিন। পদ্মবিলায় বিপ্লবীদের এ এক অভূতপূর্ব সমাবেশ। এত লোকের সমাবেশ, কিন্তু কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই। বিষয়কর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলল মহড়া। গ্রামের সাধারণ মানুষরাও বসে নেই। তারা মহড়ায় অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাবার-দাবার, জ্বালানি আর রসদপত্র সরবরাহ করল। এতসব দেখে শুনে আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন জমিদার শ্রীহরি রায়। আনন্দে চিকচিক করে উঠল তাঁর চোখ-মুখ।

আবেগাপ্ত হলক্ৰকও।

শ্রীহরি রায় ও হলক্ৰক রইস খানের আয়োজন ও বিপ্লবীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেন। তাঁরা দু'জনও বিপ্লবীদের সাথে তাঁবুতে বসবাস করতে লাগলেন।

২২ জানুয়ারী। এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীহরি রায় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এরপর যুদ্ধ মহড়া। আকর্ষণীয় এই যুদ্ধের মহড়ায় নেতৃত্ব দেন রইস খান। কুঠিয়াল ও পুলিশ বাহিনীর ইচ্ছে ছিল এ সমাবেশটাকে বানচাল করার। কিন্তু উত্তাল জনগণের আবেগ ও জাগরণ দেখে তারা আর কিছু করার সাহস পায়নি।

পাগলী সখিনার অটুহাসি

সত্যবতীর প্রত্যাখ্যান নীলকুঠির সাহেব-বাবুদের ক্রুদ্ধ করে তোলে। সত্যবতী, তার স্বামী ও বাবাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে মারা হয়।

হিঙ্গের পাড়া গ্রামের কালু বেহারা। তার যুবতী মেয়ে জরিনা। নীলকুঠির এক বাবুর নজর কাড়ে সে।

কুঠির দু'একজন কর্মচারী এসে গোপনে যোগাযোগ করে জরিনার সাথে। বলে তোর বাবা বেহারা। ভিটেটুকু ছাড়া জমি নেই, জিরেত নেই। এইভাবে কি সংসার চলে?

জরিনা ঠোঁট উল্টে বলে : সংসার কিভাবে চলবে না চলবে সেটা পুরুষ-মরদদের ব্যাপার। ঐ নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন? আর আমাদের সংসার চলছে তো খারাপ নয়।

কুঠির মতলববাজ কর্মচারী নাক সিঁটকে বলে এক বেলা চলছে, আরেক বেলা আধপেটা। এটাকে কি চলা বলে?

জরিনা বলে : তার আমি কি করব? আমি এ নিয়ে ভাববার কে?

কর্মচারী মুখ গোমড়া করে বলে : তুই যদি তোর বাপের ব্যাটা হতিস, তাহলে কি এ কথা বলতে পারতিস? নাকি বাপের কষ্ট দেখে তার পাশে না গিয়ে দাঁড়াতে পারতিস?

জরিনা বলে : আমি তো আর ব্যাটা না। কপালে ছিল তাই মেয়ে হয়ে জন্মেছি। বাপকে সাহায্য করার কতটুকুই বা সাধ্য আমার রয়েছে?

ওষুধে ধরছে বুঝতে পেরে কর্মচারী মিটিমিটি হাসে। মিষ্টি করে প্রস্তাব তুলে ধরে: তুইও পারিস। তোর গায়ে তাকত কি কম আছে? একটা কাজ-কাম জুটিয়ে নিতে পারলে বাপের হাতে কটা পয়সা গুঁজে দিতে পারিস।

জরিনা বলে : আমাকে কাজ-কাম দেবে কে?

কর্মচারীর মুখে এবার পরিপূর্ণ হাসি। বলে : তুই কাজ করতে চাইলে তোকে যে কেউ কাজ না দিয়ে পারে! আমাদের কুঠিতে বাবুদের রান্নাবান্নার কাজে একজন রাঁধুনি দরকার। তুই করবি?

জরিনা বলে : বাবুরা আমাকে কাজে নেবে না। তাদের জাত-পাত নিয়ে শতেক ঝামেলা। তারা কি আমার মত মুসলমান মেয়ের হাতের রান্না মুখে তুলবে?

কর্মচারী বলে : কুঠির বাবুদের আবার জাতপাতের বাছ-বিচার। স্নেহ সায়েবেদের সাথে রাতদিন ওঠবস করে। ওদের এখন জাত-ধর্ম বলে কিছুই নেই। তুই রাজী তো চল, আজ থেকেই কাজে লেগে যা।

জরিনা ইতস্তত করে বলে : বাপজানকে বলে আসি।

কর্মচারী বলে : তোর বাপকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। বাপের হাতে কামাইয়ের টাকা তুলে দিয়ে খবরটা দিবি। দেখবি, তোর বাপ খুশিই হবে।

কড়কড়ে লোভ ঠেকাতে পারল না জরিনা। কর্মচারীর পিছু পিছু চলে এল কুঠিতে।

আশায় আশায় বসেছিল কুঠির বাবু। জরিনাকে দেখেই তার জিভের পানি ভিজিয়ে দিল ঠোঁট। আহ্লাদে গলে গিয়ে বলল : আহা। এ যে দেখছি মজাদার জাদু রান্নাবান্না।

সেদিন সন্ধ্যায় গজব নাযিল হল জরিনার ওপর। দেশী শকুনগুলো তাকে ঠুকরে ঠুকরে নিল। যেন সে এক ভাগাড়।

এরপর তার আশ্রয় জুটল অন্ধকূপের মৃত্যু-গুহায়।

খবর শুনে ছুটে এলে সখিনা—জরিনার মা। কিন্তু তাকে ঢুকতে দেয়া হল না। মেয়ের শোকে পাগল হয়ে গেল সে।

কুঠিতে ঢুকতে না পারলেও কুঠির ছায়া ছাড়ে নি সে। দিনমান পড়ে রইল কুঠির পুকুর ঘাটে। তার অট্টহাসি কাঁপিয়ে তুলল কুঠি। শেষ দিনটি পর্যন্ত সে পুকুর ঘাটেই ছিল। আর ছিল তার শোকে মুহম্মান কুঠি-কাঁপানো অট্টহাসি।

সাহেবের কথায় কথায় টিকটিকি

কালু বেহারার মেয়ে জরিনা নীল কুঠিতে ধর্ষিতা ও নিহত। তার বিধবা স্ত্রী পাগলিনী। মেয়ের শোকে।

এই নিয়ে পুরো তল্লাট তোলপাড়। হিঙ্গেরপাড়া ও এগারপাড়ার সর্বস্তরের মানুষ এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ। কুঠিবাড়ির মেয়ে-ফুসলানো দালাল রাধামনি। রিশখানি থেকে কুঠিতে আসার পথে তাকে পাকড়াও করে লোকজন। সাহেব-বাবুদের কমিশন খেয়ে খেয়ে তার দেহটা দশাসই। পিটুনি আর কথার হলে তার অবস্থা সঙ্গীন। বিপর্যস্ত দেহ নিয়ে সে জনতার রোষ থেকে কোন রকমে পালিয়ে আসে।

উত্তেজনা অনেক দূর গড়িয়ে যেতে পারে, আর তেমন যদি হয় তাহলে নীল সাহেবদের দফারফা। এর আগেই পুরো ব্যাপারটা সামাল দেয়া দরকার, পানি আর বেশীদূর গড়াতে দেয়া ঠিক নয়—ভাবল উইলিয়াম শেরিফ।

শেরিফ তার অনুগত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে পাঠাল।

সেদিন বিকেল বেলা।

নীল সাহেবের সাথে স্থানীয় মাতব্বরদের বৈঠক বসল।

আলোচনার শুরুতেই উত্তেজনা। শেরিফও মুখর। সবাই সবাইকে দোষারোপ করছে। নিমাই মণ্ডল এক সময় শেরিফের কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন সাহেব, তুমি বড্ডো বেশি টিকটিকি কর। তোমার কথায় কথায় টিকটিকি।

এই মন্তব্য শুনে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল কুঠিয়াল শেরিফের। উত্তেজিত হয়ে চৈঁচিয়ে উঠল হোয়াট? কি বলছ তুমি? আমি টিকটিকি করি! আমার কথায় কথায় টিকটিকি!

বলতে বলতে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল সাহেব। কাঁপতে কাঁপতে হুকুম করল, নিমাই মণ্ডলকে ‘আমি নিমাই টিকটিকি’ বলতে বলতে কানে ধরে ধরে পাঁচবার ওঠ-বস করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই বৈঠকে সর লোকের সামনে নিমাই মণ্ডলের মাথায় কাদা মাখিয়ে নীল বোনা হবে। কুঠিয়ালের উৎসাহী কর্মচারীরা লাফিয়ে এল সাহেবের হুকুম তামিল করতে। এই নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত বৈঠক ভেঙে গেল। গ্রামের মাতব্বররা সাহেবদের উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে ঘরে ফিরল।

মাতব্বররা নিজেই সভা করল বিরশখানির বাঘা যতীনীর বাড়িতে। সভায় সিদ্ধান্ত হল এ এলাকায় আর নীল চাষ নয়। নীল গাছ যা রয়েছে, সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

যেই কথা সেই কাজ। এগারপাড়ার লাখেরও উপর নীল গাছের আঁটি। মৃগী বাগানের মাঠে জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হল। একইভাবে চারপাশের গ্রামগুলোতেও হাজার হাজার নীল আঁটির বরাতে এই পরিণতি ঘটল। কুঠেল শেরিফ

সাহেব তখন পালিয়ে বাঁচে না। যে কোন সময় কুঠির উপর হামলা আসতে পারে, এই ভয়ে সে তার কাগজপত্র সরিয়ে নিল খাড়াগোদা কুঠিতে। সেখানেই সে তার বাস তুলে নিল।

এদিকে কাল্পুনে থানায় পুলিশের সংখ্যা ও শক্তি বাড়িয়ে দেয়া হল। সাহেবকে মদদ দিতে আরো কয়েকজন সাহেব এসে আস্তানা গাড়ল খাড়াগোদা কুঠিতে। কুঠির সর্বত্রই ভয়ের ছাপ।

বিপ্লবীর পুনর্জন্ম

রইস খান উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পা টলছে। মাথা ঘুরছে। রক্তাক্ত দেহ। শতচ্ছিন্ন পোশাক। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালেন। কত বড় আকাশ। এই আকাশের নিচেই আল্লাহর এই জমিন। এই জমিন আজ ইবলিশ নীলকর আর তাদের অনুচরদের দত্ত পদচারণায় অপবিত্র হয়ে উঠছে। এই নাপাক জঙ্গাল সরাতে হবে ঝাঁটি মুজাহিদদেরকেই।

এক পবিত্র প্রত্যয়ে রইস খানের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চললেন কাছারি বাড়ির দিকে। কাছারি বাড়ির বন্দীখানায় জেগেছিল সত্যবতী। সারা রাত তাকে বিরক্ত করে গিয়েছে রাধামনি। নীলকরের দৃতী নষ্ট বাদী রাধামনি। সত্যবতীর কাছে অনেক ছলাকলার থলে মেলে ধরেছিল। অনেক লোভ দেখিয়েছিল। ভয়ের কথাও বলেছিল। বলেছিল, সত্যবতী সাহেব-বাবুদের মনোরঞ্জন না করে তাহলে সমূহ বিপদ হবে। শুধুই একটি রাত। এই এক রাতের বিনিময়ে তার স্বামী, পিতা, সে নিজে মুক্তি পাবে। তা না হলে সবার মৃত্যু হবে। এমনকি সত্যবতীরও। কিন্তু সত্যবতীকে এক চুলও নড়াতে পারেনি রাধামনি। এমনকি মুখে খাবারও তুলে দিতে পারেনি।

সারা রাতের জাগরণ আর মানসিক নির্যাতনের ক্লান্তিতে ভোরবেলায় ঝিমিয়ে পড়েছিল সত্যবতী। হঠাৎ কানে মধুর আওয়াজ এলো মাগো!

চমকে তাকাল সত্যবতী। সামনে তাকিয়েই সে আঁৎকে উঠল।

জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন রইস খান। ক্ষত-বিক্ষত বিপর্যস্ত দেহ। উত্তেজনায খরখর কাঁপছেন।

রইস খান কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন মাগো! এত অত্যাচার! এত কষ্ট! তারপরও তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না।

তারপরই তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন এই আমি জানালা ছুঁয়ে কসম খাচ্ছি, তোমার পর আর কোন মা-বোনকে এখানে এনে কেউ বন্দী করে রাখতে পারবে না।

এই শপথ-বাক্য উচ্চারণ করে রইস খান রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি ইচ্ছা করলে শেরিফ সাহেবের কাছে যেতে পারেন। সাহেব তাঁকে পছন্দ করে। সমীহ করে। তিনি কোন কথা বললে সে কথা রাখবে শেরিফ। এছাড়াও তাঁর মাসোহারা আর অনেক ইনাম পাওনা রয়েছে শেরিফের কাছে। কিন্তু কি লাভ ইংরেজ বেনিয়ার কাছে হাত পেতে? সেও তো শাদা চামড়ার সাহেব। লোভ আর লালসা তার সর্বাস্ত্র জড়িয়ে আছে।

রইস খান সাহেবের দরবারে আর হাত পাতবেন না। তিনি নিঃশব্দে সিন্দুরিয়ার পথ ধরে পশ্চিম দিকে এগুতে লাগলেন। তাঁর গন্তব্যের ঠিকানা তিনি জেনে গেছেন।

ভোরের হাওয়ায় মৃত্যু পরোয়ানা

কৃষক-যোদ্ধাদের হাতে পুলিশ বন্দী, এ খবরে বিচলিত হয়ে ওঠে ইংরেজ প্রশাসন। পুলিশদেরকে উদ্ধার করার জন্য নবগঙ্গা নদীপথে একটা যুদ্ধ জাহাজ ও একদল সৈন্য পাঠানো হয়। এদের নেতৃত্বে রয়েছে মরিস। দিনের বেলা নয়। দিনের আলোয় জনগণ দেখতে পেলে আর রেহাই নেই। পুলিশ দলের পরিণতি তাদেরকেও বরণ করতে হবে। তাই রাতের অন্ধকারে চুপিসারে তারা এসে নামল পোতাহাটির কাছে। এরপর পায়ে হাঁটা। রাতে-রাতেই অগোচরে সেখানকার ঘোড় দৌড়ের মাঠে ছাউনি গাড়ল।

ভোর বেলা। মাঠে ফুরফুরে বাতাস। সেনা দলে ছিল কয়েজন প্রাক্তন গোরা সৈন্য। উইলিয়াম শেরিফকে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছে নীলকর সমিতি। ভোরের ঝিরঝিরে বাতাস তাদের মনকে চাঙ্গা করে তুলল। তারা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল। ভোরের মুক্ত হাওয়া পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য তারা মাঠে হাঁটাচলা করতে লাগল। কেউ কেউ জগিং।

এসময় বিপ্লবী কৃষক-যোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন এগিয়ে যাচ্ছে কুঠির দিকে। মাগুরা, পোতাহাটি, নাথকুণ্ডু, রাঙ্গিয়ার পোতা, ধুহাটি, গোলাপপুর থেকে কৃষকরা এগিয়ে যাচ্ছে নীলকুঠির দিকে। প্রথমেই তাদের নজর গেল এই প্রাক্তন গোরা সৈন্যদের দিকে। মনের আনন্দে ভোরের হাওয়া খেতে খেতে তারা মাঠের বাইরে চলে এসেছে। কৃষকরা তাদেরকে এক নজরেই চিনতে পারল। মারমুখো জনতার সামনে এ যেন আকর্ষণীয় টোপ। কৃষদের আর পায় কে! বায়ু সেবনরত গোরা সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। অবলীলাক্রমে তাদেরকে হত্যা করল। শুরু হয়ে গেল ইংরেজ সৈন্যদের সাথে বিপ্লবী কৃষকদের মুখোমুখি লড়াই।

নারী নির্যাতনকারী সাহেব

লোকনাথপুর নীলকুঠির ম্যানেজার ম্যাকডেন। আর কার্পাসডাক্সার আর্কিবনস হিল মানিকজোড়। একজন আরেকজনের দুষ্কর্মের সাথী। দেশী যুবতী মেয়েদের প্রতি তাদের অসম্ভব লোভ। এ ব্যাপারে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে।

কৃষ্ণনগরের অপূর্ব সুন্দরী হারামনি। আর্কিবনস হিল তাকে অপহরণ করে কুঠিতে নিয়ে আসে এবং শ্রীলতাহানি করে। ঘটনাটি গাঁয়ের লোকদের মনে দাগ কেটে যায়। কিন্তু নীলকুঠির লেঠেলদের ভয়ে এনিয়ে কেউ কথা বলার সাহস পায়নি।

এর ক'দিন পর। আসাননগর অঞ্চলের একটি মেয়েকে চোখে লেগে যায় হিলের। ম্যাকডেনের সহযোগিতায় সে মেয়েটিকে অপহরণ করে। এর মধ্যেই এলাকার পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গেছে। চারপাশ থেকে নীলকুঠির বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের খবর তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে এই নিয়ে আলোড়ন।

এই সময়েই হিল অপহরণ করে মেয়েটিকে। সে তাকে নিয়ে আসে লোকনাথপুরে। ম্যাকডেনের কুঠিতে। মৌজের রাত এখানেই বসবে।

খবর পৌছে গেল গ্রামবাসীদের কাছে। কার্পাসডাক্সার হিল সাহেব মেয়ে ধরে এনেছে কুঠিতে। এ খবর গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। প্রতিবাদের আওয়াজ ওঠে গ্রামে। সাথে সাথে সংগঠিত হতে থাকে তারা। কুতুবপুরের ইলাহী বখশ। দুর্গাপুরের লেঠেল বীর ঈমান আলী সরদার আর কার্পাসডাক্সার বেদ্যনাথ বিশ্বাস ও হর্ষপ্রিয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে শত শত কৃষক লোকনাথপুরের কুঠি ঘেরাও করল। কুঠির লেঠেলরা বাধা দিতে এসে বেদম পিটুনি খেয়ে পালিয়ে জান বাঁচাল। কৃষকরা অপহৃত মেয়েটিকে সসম্মানে মুক্ত করল। কৃষকদের হামলায় গুরুতর আহত হল কুঠির নায়েব দীননাথ ও আর্কিবনস হিল। কুঠেল ম্যাকডেন অবস্থা বেগতিক বুঝে পালানোর পথ খুঁজে নিল। এক বিধবার ঘরে আশ্রয় নিয়ে সে প্রাণরক্ষা করল। সাহেবরা আক্রান্ত হয়েছে, এ খবরে বিচলিত হয়ে উঠল কুঠেলদের চামচা কুড়ুলগাছি গ্রামের উমেশচন্দ্র গাঙ্গুলি। সে পুলিশ দল আর তার অনুগত বাগদী বাহিনী নিয়ে নীলকুঠির ইজ্জত রক্ষা করতে এগিয়ে এল। বাগদী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল মুখতারপুরের দস্যু সর্দার বিজয় বাগদী।

খবর পেয়ে গেল লোকনাথপুরের বিপ্লবী কৃষকরা। সাথে সাথেই তাদের ভেতর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। দেখতে দেখতে হাজার হাজার কৃষক সংঘবদ্ধ হল। তারা লাঠি-সড়কি নিয়ে জয়রামপুরের কাছে লোকনাথপুরের আসার রাস্তা আগলে অপেক্ষা করতে লাগল।

পুলিশ ও বাগদীরা পৌছতে না পৌছতে যোরতর লড়াই শুরু হল। পুলিশ নির্বিচার গুলি ছুড়তে লাগল। এতে অনেক কৃষক হতাহত হল। কিন্তু তাদেরকে ছেড়ে দেয়নি

কৃষকরা। পুলিশের গুলি ছুটছে। এতে ভয়-ভর নেই কৃষকদের। গুলির বৃষ্টি মাথায় নিয়েই তারা ধেয়ে আসছে। তাদের বুক-ভরা অসম সাহস। ভাড়াটে পুলিশ আর বাগদীরা পালানোর পথ খুঁজতে লাগল। বিপ্লবী কৃষকরা দস্যু সর্দার বিজয় বাগদীসহ কয়েকজনকে হত্যা করে। পুলিশদের নিকট থেকে রাইফেল ও অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে বন্দী করে রাখে।

শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী এসে বন্দী পুলিশদের উদ্ধার করে। কিন্তু এতেও এ যুদ্ধ থামেনি। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতেই থাকে দীর্ঘদিন। এতে নিশ্চিন্তপুর এস্টেটের সহকারী এটর্নি রাধামাধব দোবে লোকনাথপুরের প্রজাদের হাতে নিহত হয়। আতংক দেখা দেয় নীলকরদের মধ্যে। কুঠিয়াল ও নীলকর সমিতি নিশ্চিন্তপুর কনসার্ন আক্রমণের আশংকায় শান্তি সভা ডাকে। কিন্তু মারমুখো জনতার রোষ এতে কমেনি এতটুকুও। নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা তাদের ক্ষোভকে আরো বাড়িয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত নীলকর সমিতি লোকনাথপুরের ম্যানেজার ম্যাকডেনকে রেল গাড়িতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় পর্ব

বাঁ শে র কে ল্লা



পোষ মানাতে বাঘের বাচ্চা

বালক তিতুমীর। খেতে বসেছেন। পাশে খাবার-ব্যাঞ্জন পরিবেশন করছেন তাঁর আম্মাজান। চঞ্চল ছেলে। কখন কোথায় কিভাবে কাটান, কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ছেলে নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত পান না।

তিতুমীর খাচ্ছেন মন দিয়ে। খেতে খেতে হয়ত আপন মনে ভাবছেন এটা-ওটা।

এসময়ই খাবার ঘরে উঁকি দিল একটি কচি মুখ। তিতুর বন্ধু। তিতু খাবার থাল থেকে মুখ তুলে তাকালেন। তাঁর চোখে-মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

আগন্তুক-বালকের চোখে-মুখে রুদ্ধ উত্তেজনা। এক দৌড়ে সে ছুটে এসেছে। এখনো হাঁফাচ্ছে। তড়বড় করে বলল বাঘের বাচ্চা। আমাদের গাঁয়ে বাঘের বাচ্চা দেখা গিয়েছে।

তিতুমীর সবিস্ময়ে বললেন বাঘের বাচ্চা! দূর বাঘের বাচ্চা আসবে কোথেকে?

বালক জানাল : বাঘের বাচ্চাই। খড়গাদার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। দেখবে যদি এসে।

তিতুমীর ভাতের থালা রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : ইস! কদিন থেকে পুষবো বলে বাঘের বাচ্চা খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাহলে সত্যি সত্যি বাঘের বাচ্চা পাওয়া গেল।

বালক তিতুমীর তাঁর সাথীকে নিয়ে তখনই ছুটলেন বাঘের বাচ্চা ধরতে। কিন্তু ততক্ষণে বাঘের বাচ্চা পালিয়ে গিয়েছে।

দাড়ির খাজনায় বিড়ম্বনা

তিতুমীরের বয়স হয়েছে। তিনি এখন আর বালক তিতু নন। বিপ্লবী মুজাহিদ তিতুমীর। তাঁর উনচল্লিশ বছর বয়সে মক্কায় গিয়েছিলেন হজ্ব করতে। সেখানে সাক্ষাৎ আরেক মুজাহিদের সাথে। সৈয়দ আহমদ ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ বেনিয়াদের তাড়িয়ে দিয়ে খোদার রাজ কায়ম করার স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর কাছেই তিতুমীর জানলেন, ইসলাম কুসংস্কারাঙ্কন কোন ধর্মমাত্র নয়, ইসলাম মানুষের জীবন-দর্শন। এখানে ভগু পীর-মোল্লাদের কোন স্থান নেই। মানুষের পরিচয় তাঁর আমলে, মনুষ্যত্বে—বংশ গৌরব, আভিজাত্য বা বিপ্লু নয়। মহাজনি সুদ ধর্ম-বিরোধী শোষকের হাতিয়ার। মুসলমান মানে আল্লাহর কাছে নতজানু হওয়া, আর কারো কাছে নয়।

সৈয়দ আহমদের সাথে তিতুমীরের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে কলকাতায়। ১৮২১ সালে। সৈয়দ আহমদ তখন সারা ভারত ঘুরে জেহাদী জাগরণের ডাক দিচ্ছেন। উদ্দীপ্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন তিতুমীর।

শুরু হল তিতুমীরের আন্দোলন। এ আন্দোলন ধর্মে প্রত্যাবর্তনের জন্য। গরীব রায়তের জাগরণের জন্য। শোষণের নাগপাশ থেকে মহামুক্তির জন্য।

কঁপে উঠল কায়েমি স্বার্থের আরাম কদারাগুলো। জমিদাররা রেগে গেল। ভণ্ড পীররা গোস্বা করল। মহাজনরা স্ক্যাপে উঠল। তারা হিন্দু হোক আর মুসলমান, স্বার্থের আঁতে ঘা লাগাতে সবাই এককাটা। তিতুমীরকে সামাল দাও।

এদিকে দলে দলে লোক এসে সামিল হল তিতুমীরের পতাকা তলে। গরীব রায়ত, কিষাণ, জোলা, চামার, কুমোর, জেলে, মুচি, মজুর, মুসলমান তো বটেই, হিন্দুরাও। ওরা যেন জীবনের নতুন বাণী শুনছে।

কৃষ্ণদেব রায়। প্রতাপশালী জমিদার। তাঁর ডাকে নাকি বাঘে-হরিণ এক ঘাটে পানি খায়। তিতুমীরের তৎপরতায় আশংকিত হয়ে উঠল জমিদার। নেড়েটাকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। আখেরে বিপদ হতে পারে।

হিসেব-নিকেশ করে জ্বালাতনের অদ্ভুত বুদ্ধি বের করল। যদি এই কৌশলে তিতুমীরের ভক্তের সংখ্যা কমানো যায়। মুসলমান যারা দাড়ি রাখবে, মাথাপিছু তাদেরকে খাজনা দিতে হবে আড়াই টাকা করে।

পুরা গ্রামে খাজনা আদায় হল নির্বিঘ্নে। এরপর সরফরাজপুর। সরফরাজপুরের লোকেরা গেল হায়দারপুরে। তিতুমীরের কাছে। তিতুমীর সব কথা শুনে বললেন এটা একটা কথা হল নাকি। দাড়ি রাখা আমাদের ধর্মের বিধান। তার উপর জমিদারী খাজনা? এটা কৃষ্ণদেবের শয়তানি। কেউ খাজনা দেবেন না। জমিদারের কাছারিতেও কেউ যাবেন না। এরপর যা হয় আমরা করব। দেখি, জমিদার কতদূর যেতে পারে।

এর আগে জমিদার সরফরাজপুরবাসীদের ডেকে দশ দিনের মধ্যে দাড়ির খাজনা দেয়ার হুকুম দিয়েছিল। দশ দিন পেরিয়ে গেল। কেউ আর কাছারিতে গেল না। খাজনাও দিল না। কৃষ্ণদেব রেগে-মেগে আগুন। তখনি ভাঁড়ারী মুচিরামকে পাঠাল মুসলমান প্রজাদের তলব করতে। মুচিরাম চলল। সাথে বরকন্দাজ।

সরফরাজপুর মসজিদে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন তিতুমীর।

মুচিরাম জমিদারের হুকুম জানাল। শুনে হেসে উঠলেন তিতুমীর। বললেন খাজনাটা তোমাকে দেব, নাকি তোমার জমিদার বাবুকে? নাকি তোমাদের দু'জনকেই বেঁধে রাখবো এখানে?

ভয় পেয়ে পালাল মুচিরাম। বরকন্দাজ হাষি-তাষি করতে গিয়ে নাজেহাল হল।

কৃষ্ণদেবের রাগ আরো বেড়ে গেল। তিতুমীরকে ধরে আনতে চারজন বরকন্দাজ পাঠাল। চার বরকন্দাজ লাঠি বাগিয়ে বীর-বিক্রমে রে-রে করতে করতে ছুটল।

সরফরাজপুরের মাটিতে পা দিয়েই তারা থমকে দাঁড়াল। তিতুর দলের লোকেরা লাঠিসোঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সীসা ঢালা প্রাচীর। বরকন্দাজরা ভড়কে গেল। তাদের পেশাদারী হাত থেকে ফসকে পড়ে গেল লাঠি। পিছু ফিরে ছুটে পালাল। পেছন থেকে শুনতে পেল মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি আল্লাহ্ আকবর।

শাহাদাতের দরজা

সারা এলাকায় টি টি পড়ে গেল। জমিদার হার মেনেছে সংঘবদ্ধ প্রজাদের কাছে। কৃষ্ণদেব রায়েব মাথা হেট। তিতুমীরের ভয়ে পালিয়ে এসেছে তার বরকন্দাজরা।

কৃষ্ণদেব রাগে ফোলে। কিন্তু এখন নয়, সময়ে নেয়া হবে প্রতিশোধ। সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে তিতুমীরের দলকে। বাড়তে দিলে উপড়ে নেবে তাকেই।

সময় গোণে কৃষ্ণদেব। আর লেঠেল জোগাড় করে। বাঘা বাঘা চৌকস লেঠেল। মায়া নেই। পয়সার বিনিময়ে নিজের বাপকেও খুন করতে পারে। এমন সব নির্দয়-হৃদয়হীন লোকজন নিয়ে সাজায় সে তার লেঠেল বাহিনী। একদিন চুপিসারে সরফরাজপুরে ঢুকল 'তিন-চারশ' লোক, লাঠিসোটা, সড়কি-বল্লমে সেজে। তাদের দলপতি হয়ে এল স্বয়ং জমিদার কৃষ্ণদেব রায়।

সরফরাজপুর সেদিন ছিল সুমসাম। কেউ আশংকা করেনি গুপ্ত ঘাতক আসছে। পুরো গ্রাম তছনছ করে দিতে। একতাবদ্ধ প্রজাদের সামনে বাঘা জমিদারও যে কাপুরুষ হয়ে যায় এ সবাই জানে। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় যে এত কাপুরুষ, এ জানা ছিল না কারো। 'তিন-চারশ' লেঠেল নিয়ে সে যে চোরাগুপ্তা হামলা চালাতে পারে, কোন আগাম-জানান না দিয়েই—এ কেউ ভাবতে পারেনি।

পুরুষরা তখন মসজিদে। নামাজ আদায় করছিল। সরফরাজপুরের অনেক পুরোন মসজিদ এটি। এর উপর একবার বর্গিরা হামলা চালিয়েছিল। তখন প্রায়-ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল মসজিদটি। তিতুমীর এটির সংস্কার সাধন করে তাঁর কেন্দ্র বানিয়েছেন। এখান থেকেই তিতুমীরের আওয়াজ পৌছে যায় চারপাশে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে কথা বলে, মত বিনিময় করে তিতুমীরের সাথে। তারপর বিপ্লবের মন্ত্রে নতুন করে দীক্ষিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে।

কৃষ্ণদেব ভাবল, এই মসজিদটা ধ্বংস করলেই তিতুমীরের সব শেষ। প্রজাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে। তারা আবার অনুগত হবে জমিদারের। সব অত্যাচার-অন্যায় মুখ বুঝে মেনে নেবে।

কৃষ্ণদেব তার লোকজন নিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল মসজিদে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। তাই দেখে আহ্লাদে আটখান হল কৃষ্ণদেব আর তার লেঠেলরা।

আগুন কি সব জ্বালিয়ে দিতে পারে? মসজিদের আগুন খুলে দিল শাহাদাতের দরজা। নামাজরত অবস্থায় শহীদ হলেন দু'জন। আগুনে ঝলসে আহত হলেন কয়েকজন।

মসজিদে আগুন দিয়েই দুর্বৃত্ত লেঠেল দল হামলা করল গ্রামের উপর। গুরু হল লুটপাট। জুলুম।

আচমকা আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিল সরফরাজপুরের লোকজন। মুহূর্ত মাত্র। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তারা রুখে দাঁড়াল। গুরু হল দাঙ্গা।

কৃষ্ণদেব যত সহজেই বিজয় অর্জন করবে ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত তা আর সহজ রইল না। সাহসী মানুষদের রুখে দাঁড়ানোয় ভাড়াটে লেঠেলরা পালানোর পথ পেল না। গায়ে-গতরে জখম নিয়ে জমিদারবাহিনী ছত্রাণ হয়ে পড়ল। যে যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচল।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তখন-তখনি তার জমিদারীতে না গিয়ে ক'দিনের জন্য গা ঢাকা দিল।

চৌরের সাক্ষী গাঁটকাটা

কৃষ্ণদেব রায়ের লেঠের বাহিনী সরফরাজপুর হামলা চালানোর পর জমিদার ও গ্রামবাসী উভয়পক্ষ থানায় নালিশ জানাল।

প্রজারা বলল জমিদারের লেঠেল আমাদের ঘরবাড়ি লুণ্ঠ করেছে। মসজিদ জ্বালিয়েছে। নিরীহ মানুষ খুন করেছে।

জমিদারের নায়েব নালিশ করল তিতুমীরের লোকজন আমাদের বরকন্দাজ আটকে রেখেছে।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ক'দিন আত্মগোপন করে থেকে উপস্থিত হল বারাসতে। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাল আমি অনেকদিন থেকে আমার জমিদারির বাইরে ছিলাম। জানতে পারলাম, আমার জমিদারীতে বেশ গোলমাল পাকিয়েছে। আমি এর কিছুই জানিনে।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ করল বসিরহাট থানাকে। থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তী। জমিদারের আর বড় লোকদের জন্য তার মনটা উদার। গরীব সে দুই চোখে দেখতে পারে না। ফাও যা আয়, সেসব ত আসে ঐ বড়লোক জমিদারদের কাছ থেকেই।

রামরাম চক্রবর্তী এল সরেজমিন তদন্তে। পুঁড়ায় কাছারির কাছেই বসে আয়েসে উপায়ে লেহা-চোষা-পেয় সব উজাড় করল। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল তাহলে মামলাটা এই। আমি থাকতে জমিদার বাবুকে কোন চিন্তা করতে হবে না। ও চিন্তা আমাদের। এ জনেই-ত বৃটিশ উর্দি গায়ে চড়িয়েছি, হাফ প্যান্টে লজ্জা ঢেকেছি।

ফিরে এসে রিপোর্ট করল দারোগা : যত দোষ নন্দ ঘোষ। জমিদার মশাই ধোয়া তুলসি পাতা—বিশুদ্ধ গঙ্গাজল। তিতুমীরের লোকজনই ষড় করে নিজেদের মসজিদে আগুন জ্বালিয়েছে। জমিদার বাবুকে ফাঁসানোর মতলব। জমিদারের লোকরা সেখানে গিয়েছিল বটে, তবে তারা ঋষি-ঠাকুর—খড়কুটোটিও ছুঁয়ে দেখেনি।

বারাসতে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস। সেখানে উঠল মামলাটি। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কলম বাগিয়ে বসল তিতুমীর আর গ্রামবাসীদের জেলে চুকাবে বলে।

তিতুমীরদের পক্ষ থেকে বলা হল : দাঙ্গা-হাঙ্গামার আঠারো দিন বাদে জমিদারের নায়েব বাদুড়িয়া থানায় গেল নালিশ ঠুকতে। এটা-ত সাজানো মামলা। দারোগা রামরাম চক্রবর্তী নির্ভেজাল ঘুষখোর। ঘুষ হজম করে সে জমিদারের পক্ষ নিয়েছে। অতএব সাক্ষী তলব করা হোক।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট দেখল, মামলা জমিদারের অনুকূলে নয়—উল্টো সে ফেঁসে যেতে পারে। এ অবস্থায় তিতুমীরের দলবলই জিতে যেতে পারে। এটি যেমন জমিদারের জন্য ভাল হবে না, তেমনি ভাল হবে না বৃটিশ শাসনের জন্য।

প্রজাদের কথায় কান দিল না জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। অনেক ভেবে-চিন্তে মামলা ডিসমিস করে দিল সে। উভয় পক্ষকে হুকুম করল শান্তি রক্ষা করে চলতে।

প্রজারা মনে মনে বলল : জমিদারকে বাঁচিয়ে মামলা ডিসমিস। শান্তির আর বাকী রইল কি! কেবল ত মাত্র গুরু।

বিচারের বাণী নিভতে কাঁদে

সরফরাজপুরে হামলা চালিয়েছিল জমিদার। মসজিদে আগুন জ্বালিয়ে দু'জন মুসল্লিকে শহীদ করেছিল তার লোকেরা। তার লেঠেল বাহিনী তছনছ করেছিল পুরো গ্রাম। উল্টে গ্রামের লোকদের বিরুদ্ধে নালিশ ঠুকেছিল জমিদারের নায়েব।

সবাই ভেবেছিল জমিদার আর তার লেঠেল-বরকন্দাজদের একটা কিছু হয়ে যাবে। দেশে আইন-কানুন বলে কিছু-ত আছে।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্রমাণ করাল, ইংরেজ কোম্পানির রাজত্বে গরীব রায়তের পক্ষে কোন আইন-কানুন নেই। মামলা ডিসমিস। সাহস বেড়ে গেল জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের। জমিদারের হুকুম অমান্য। জমিদারের বিরুদ্ধে নালিশ।

পক্ষে আছে ম্যাজিস্ট্রেট। লাট সাহেব। তিতুমীরের আক্ষারায় রায়তরা বড় বাড় বেড়েছে। আর বাড়তে দেয়া যায় না।

জমিদারের অত্যাচার নানান রূপ নিয়ে নেমে এল তিতুমীরের দলবল আর গরীব হিন্দু-মুসলমান রায়তের উপর। জুলুমের উপর জুলুম। নাতিশ্বাস তোলার অবস্থা।

সুযোগ পেলেই জমিদারের বরকন্দাজরা তিতুমীরের অনুসারীদের ধরে-বঁধে নিয়ে আসে জমিদার কাছারিতে। আটকে রেখে আদায় করে রকমারি খাজনা। দাড়ির খাজনাও তার মধ্যে রয়েছে।

মিথ্যা অভিযোগ তুলে প্রজাদের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি করায়। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মানুষ। জমিদার বাবুর হরিহর আত্মা। জমিদারের পক্ষ নিয়ে বেরোয় তার সব রায়। তাক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠে প্রজারা।

শেষ-মেষ ওরা সিদ্ধান্ত নেয়, জমিদার আর ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যায়-জুলুমের বিরুদ্ধে নালিশ করবে জজ সাহেবের কাছে। সব সাহেবই যে খারাপ তা-ত নাও হতে পারে।

শুনে হাসলেন তিতুমীর। বললেন ওরা বেনিয়া শাসক। জাতে সবাই এক। তোমরা ফরিয়াদ জানাতে চাও, জানাও। তবে ফায়দা কিছু হবে বলে মনে হয় না।

তিতুমীরের ভাগনে মাসুম। দলবল নিয়ে গেলেন কলকাতায়। বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অন্যায় বিচার আর কৃষ্ণদেব রায়ের জুলুমের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে।

জজ সাহেব মহাব্যস্ত। তাঁর কোর্ট-কাছারি রয়েছে। সমাজ রয়েছে। ক্লাব রয়েছে। অজ-মফস্বল থেকে আসা গরীব নেটিভদের ফরিয়াদ শোনার সময় কোথায় তাঁর।

মাসুমদের আসা-যাওয়াই সার। একদিন খবর পেলেন, জজ সাহেব বাথেরগঞ্জ গেছেন। উঠেছেন সার্কিট হাউজে। প্রমোদ বিহারে তিনি কাটাবেন কিছুদিন।

মাসুম আর তাঁর লোকজন বুঝে গেছেন। ন্যায় বিচার তাঁদের ভাগ্যে নেই। ফিরে এলেন তাঁরা।

কিন্তু মনের ভেতরে তুষের আগুন। বিদ্রোহের। জুলুমের বিরুদ্ধে একটা পথ-বিদ্রোহ। জমিদারকে মানি না। ইংরেজ শাসন মানি না।

মজলুম যখন এক জোট

১৮৩১। ২৩ অক্টোবর। নারিকেলবেড়ে মইজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়ি। তিতুমীরের আশ্রানে তাঁর অনুসারীরা জমায়েত হলেন। তাঁদের সাথে যোগ দিলেন মিসকিন শাহ আর ফকিরদের দল। মিসকিন শাহ সংসারত্যাগী ফকির। দেশের মাটি থেকে বেনিয়া শাসন উৎখাত করার জন্য তাঁরাও নেমেছেন ময়দানে। এসেছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গরীব দুঃখী রায়তরা। জমিদারের জুলুম চোখ বন্ধ করে আর মেনে নেয়া যায় না। তিতুমীর দেখতে পেলেন জমিদারের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি একা নন। তাঁর সাথে একজোট হয়েছে এলাকার সব মজলুম।

তিতুমীর সবার কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। সেই টাকায় চাল-ডাল আর লড়াইয়ের হাতিয়ার কিনলেন। শুরু হল প্রস্তুতি।

নারিকেলবেড়ের ধনবান গৃহস্থ পিয়ার মণ্ডল। মজলুমের আর্থনাদ আর প্রতিবাদের ভাষা তাঁর কানেও পৌছেছিল। তিনিও আলোড়িত হলেন। সমর্থন জানালেন তিতুমীরকে।

৬ নভেম্বর। ভোর। তিতুমীর তিন শ' লোকের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন পুঁড়ার দিকে।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায় আগেই খবর পেয়েছিল তিতুমীরের নেতৃত্বে মজলুমরা সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। শুনেই সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। নিজের অপরাধের খতিয়ানের

দিকে তাকিয়ে দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল এবার তার হিসাব দেয়ার পালা। জোটবদ্ধ মজলুমদের হামলার চোটটা তার উপর দিয়েই যাবে। সে কর্তৃপক্ষের সাহায্য চেয়ে আবেদন জানাল। তিতুমীর-ত সামান্য একজন মানুষ, কিই-বা সে করতে পারে—এই ভেবে কর্তৃপক্ষ তার আবেদনে গুরুত্ব দিল না।

তিতুমীর কি, জানে কৃষ্ণদেব। কর্তৃপক্ষের সাহায্য না পেয়ে সে ঘাবড়ে গেল আরো। নিজেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। ভয়ে ভয়ে তার দিন কাটে। ছায়া দেখলেও ভয়। এই বুঝি তিতুমীর এলেন।

এ সময়ই খবর এল, তিতুমীর এসেছেন। সদলবলে। কৃষ্ণদেব রায় সাথে সাথে হুকুম করল মূল ফটক বন্ধ করে দেয়ার জন্য। জমিদার বাড়ির সবগুলো দরজা-জানালাও। বরকন্দাজরা ছাদে আর প্রাসাদের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। কৃষ্ণদেব ঘরের ভেতর ঠকঠক কাঁপতে লাগল।

তিতুমীর প্রথমে আক্রমণ করল জমিদার বাড়ী। ঘিরে ফেলে গুরু হল হামলা। সবার হাতে লাঠি, সড়কি, তরবারি। মুজাহিদদের এ এক ভয়ংকর রূপ। ঘরের ভেতর কৃষ্ণদেবের কাঁপুনি আরো বেড়ে গেল।

লাগাতর কিছুক্ষণ হামলার পর তিতুমীর বললেন হয়েছে। আমরা জমিদারকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। জানাতে চেয়েছিলাম, মজলুম রায়তদের ধনসম্পদ ক্ষমতা কিছুই নেই। শক্তি নেই দেশের আইন-আচার, শাসন-বিচার কিনে নেয়ার। কিন্তু মজলুমের বন্ধু মজলুমই। আমাদের সম্মিলিত শক্তির সামনে জমিদার তুচ্ছ। জমিদার এটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। সুতরাং জমিদার বাড়িতে আর শক্তি ক্ষয় করে লাভ নেই।

মুজাহিদ বাহিনী ছড়িয়ে পড়ল পুঁড়া গাঁয়ে। ঘোষণা করতে লাগল তাদের বিপ্লবী বাণী। গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিল, তারা তাদের মতই মজলুম প্রজা। জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের এই প্রতিবাদ।

গাঁয়ের বারোয়ারি তলায় ছিল এক মন্দির। সেখানে খ হাতে গুঁৎ পেতে ছিল জমিদারের খাসপুরোহিত। নেড়েদের সাথে মিলে-মিশে ছোটজাতের হিন্দুদের এই লাফালাফি তার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকজন তার মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতেই সে খ উচিয়ে রে রে করে ছুটে এল। আচমকা একজনের ঘাড়ের উপর খ নামিয়ে দিল। লোকটি মুণ্ডু-কাটা হয়ে সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ল বারোয়ারিতলার ধুলোয়। ব্রাহ্মণ ঠাকুর আবার উচিয়ে ধরল খ। খুনের নেশায় তার রক্তজবা চোখ।

মুজাহিদরা মুহূর্তে সতর্ক হয়ে পড়েছিল। ঠাকুরকে আর সুযোগ দেয়া হল না। তরবারির আঘাত নিয়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হল।

মুজাহিদদের আক্রমণ কেবলমাত্র জমিদারের বিরুদ্ধেই চলেনি, শোষক মহাজন মুসলিম ধনবানদের বাড়িও তছনছ করা হয়।

বাঁশের কেল্লায় স্বাধীন সরকার

‘এলাহি ভাবিয়া বাঁশের বানাইল কেল্লা ।

ঘাস বাঁশ দিয়া তবে বানাইয়া ছেল্লা ॥

তাহার ভিতরে জমা সকলে রহিলো ।

বেদিন দেখিয়া মোনে সঙ্কট জানিলো॥’

তিতুমীর বললেন জমিদারের গায়ে হাত দিয়েছি। এটিই শেষ নয়। এই হল শুরু। ফেরার আর কোন পথ নেই।

নারিকেলবেড়ের বানানো হল বাঁশের কেল্লা। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। বিরাট এলাকা জুড়ে বাঁশের পর বাঁশের শক্ত গাঁথুনি। ‘কেল্লার রচনা কৌশলময়—দৃশ্য সৌন্দর্যময়।’ কেল্লায় কামরার পর কামরা। অনেকগুলো। কোন কামরায় যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। তরবারি, বর্শা, সড়কি, পাকা বাঁশের ছোট-বড় লাঠি। কোন কামরায় বেল, পাথর আর ইটের টুকরোর স্তুপ। কোন কামরায় খাবার-দাবারের মজুত। কামরাগুলোতে থাকার ব্যবস্থা, নামাজঘর। এতবড় কেল্লা যে দু’হাজার লোক এখানে অন্যায়সে দিনের পর দিন থাকতে পারে।

বাঁশের কেল্লায় বসে তিতুমীর ঘোষণা করলেন আজ থেকে হিন্দুস্তানের মাটি হতে ইংরেজ রাজত্ব খতম হয়ে গেল। বালাকাটে মহান মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ যে আওয়াজ তুলেছিলেন সেই আওয়াজ আজ থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এ দেশ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পাততাড়ি গুটাতে হবে। এ দেশ আমাদের। এখানে আমরাই রাজত্ব করব। এ দেশ মজলুম জনগণের—শাসনও তাদের। জমিদাররা আর কোম্পানিকে খাজনা দিতে পারবে না। খাজনা দিতে হবে জনগণের সরকারকে। এ মাটির উপর আজ থেকে খোদার আইন কায়েম হয়ে গেল। এই আইন কায়েম করতে গিয়ে হয় আমরা বিজয়ী গাজী হব, না হলে শহীদী রক্তে আমাদের জিন্দেগানী হেসে উঠবে। আল্লাহ্ আকবার।

তিতুমীর হলেন স্বাধীন সরকারের প্রধান। মইজুদ্দীন হলেন উজির। মাসুম সেনাপতি। বাকের মণ্ডল জমাদার। নামাজ ও মুনাযাতে পর নতুন সরকারের অভিষেক হল।

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল খবর। স্বাধীন সরকারের প্রতি জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে উঠল আশপাশ এলাকার মজলুম প্রজারা। চিঠি গেল জমিদারদের ঘরে ঘরে আজ থেকে খাজনা তিতুমীরের সরকারকেই দিতে হবে। আর কাউকে নয়।

জনগণ নতুন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনেতে শুরু করল।

নীল সাহেবের আতংক

তিতুমীরের চিঠি গেল জমিদারদের কাছে। নীল সাহেবদের কাছেও। খাজনা কোম্পানির কাছে দেওয়া চলবে না। এ দেশের তারা কেউ না। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। খাজনা দিতে হবে তিতুমীরের সরকারকে। তা না হলে প্রজারা কেউ জমিদারদেরকে খাজনা দেবে না। প্রজারা সমস্বরে সম্মতি জানাল।

প্রমাদ গুণল জমিদাররা। প্রজাদের রাজত্ব চালু হলে তাদের জমিদারি চালানোই-ত ভার হয়ে দাঁড়াবে। জমিদাররা তলে তলে জোট পাকাতে শুরু করল। তিতুমীর কেবলমাত্র কৃষকদের সমস্যা নয়, তাদের জন্যও মাথা ব্যথা।

গোবরডাঙ্গার জমিদার কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিতুমীরের চিঠি পেয়েই তার মাথা বিগড়ে গেল। লাতু বাবু। কলকাতার প্রতাপশালী জমিদার। তার কাছে সাহায্য চাইল কালিপ্রসন্ন। তিতুমীরের কিছু কিছু খবর কলকাতাতেও পৌঁছেছিল। কোম্পানির সরকার এই বিদ্রোহীকে এখনো শাস্তি করেছে না কেন, এটা তাদের জিজ্ঞাসা। তা না করুক, তিতুমীরকে উৎখাত করতে স্থানীয় জমিদারদের সাহায্য করবে তারা। লাতু বাবু তার দুই শ' হাবসী পাইক, দুই শ' লেঠেল আর কয়েকটি হাতি। এর সাথে যুক্ত হল লাতু বাবুর পাঠানো দুই শ' পাইক। বাহিনী হিসেবে মন্দ নয়। এই সাহসে ভর করে কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তিতুমীরকে খাজনা দিতে অস্বীকার করল।

ডেভিস সাহেব। মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজার। তিতুমীরের উত্থান সে সশংক হয়ে লক্ষ্য করছিল। জমিদারদের সাথে যোগসাজশে সে কৃষকের জমিতে নীল বিষ ঢেলে দেয়। প্রজারা আর আগের মত অনুগত নয়। নীল চাষ করতে তারা বিপ্লের সৃষ্টি করছিল। এ সবই তিতুমীরের অনুপ্রেরণা। এ ধারা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তাকে নীল কুঠিই তুলে দিতে হবে। তিতুমীরের তৎপরতা তার জন্য বিপদের। এ জন্য কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যের আবেদন সে ফেলতে পারল না। জমিদাররা সবাই জোট বাঁধছে। এ জোটে সামিল হলে তারও লাভ। তিতুমীরকে শিক্ষা দেয়া যাবে। প্রজাদেরকেও শাস্তি করা যাবে। সে নিজে দুই শ' লেঠেল, সড়কিওয়ালা আর বন্দুকধারী নিয়ে এগিয়ে এল।

ডেভিসের নেতৃত্বে বাহিনীটি আক্রমণ করল তিতুমীরকে। যত সহজে তিতুমীরকে কাবু করবে ভেবেছিল, ব্যাপারটা অত সহজ আর রইল না। ডেভিসের বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করতে না করতেই তারা দেখতে পেল, তিতুমীরের লোকজন তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে।

ডেভিস এসেছিল বজরায় করে। ইছামতি নদীর কোল ঘেঁষে সে তার বজরা থামাল। নদীর পাড়ে জমিদার রেখেছিল হাতি। সাহেবকে বরণ করে নেয়ার জন্য। ডেভিস গিয়ে উঠল হাতির পিঠে। তারপর চলল তিতুমীরকে শাস্তি করতে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে পরিস্থিতি অন্যরকম। তার লোকেরা তিতুর লোকদের হাতে বেধড়ক মার খাচ্ছে। বন্দুকবাজিতে কোন কাজ হচ্ছে না। হাতির পিঠে সাহেবকে দেখেই প্রজ্ঞারা ক্ষ্যাপে উঠল। অই এসেছে, সাহেবের বাচ্চা, নীলের আবাদি। নীল বিষ ওকেই গেলাও। ধরো ওকে।

শত শত লোক ছুটে এল সাহেবের হাতির দিকে। লাঠি, বর্শা, সড়কি হাতে। মারমুখী ভয়ংকর চেহারা। দেখেই সাহেবের পিলে চমকে উঠল। হাতি গেল ভড়কে। উল্টো দিকে ঘুরে ছুটে লাগল। ছুটে ছুটে এল বজরার কাছে। ডেভিস ভেবেছিল, বজরায় উঠে পালাবে। সে সুযোগ তার জুটল না। পেছনে তেড়ে আসা লোকজন তাকে ধরল বলে। ডেভিস ঘাবড়ে গিয়ে জনতার উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল। কারো গায়ে গুলি লাগল না। জনতা আরো ক্ষীণ হয়ে ছুটে আসতে লাগল।

হাতিকে কিছুই বলতে হল না। ঝাঁপিয়ে পড়ল ইছামতির কোলে। ভীত-সন্ত্রস্ত ডেভিস হাতির পিঠে নদী পেরুতে পেরুতে দেখল, বিক্ষুব্ধ জনতা তার বজরা টেনে তুলেছে তীরে। শত আক্রোশ নিয়ে বজরাটাকেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করছে। জবু-থবু ডেভিস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হঠাৎ তার শরীর কেঁপে উঠল। তিতুমীরের আতংক এখনো কাটেনি।

মুজাহিদের মৃত্যু নেই

দেবনাথ রায়। গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার।

ডেভিস আর তার পরাজিত দলবল এসে আশ্রয় নেয় দেবনাথ রায়ের বাড়িতে। দেবনাথ হংকার ছাড়ে কে তিতুমীর? আসুক দেখি আমার এলাকায়। তাকে আর ফিরে যেতে হবে না।

তিতুমীর আর তাঁর দলবল এসে হাজির হয়। বলেন আমরা এসেছি। আবার দুষ্টের দমন করে ফিরেও যাব। দেবনাথ গরীব প্রজার ঘরে আগুন দেয়। সাহেব-সুবোদের পা চেটে তার অনেক বাড় বেড়েছে। এবার তার ইতি ঘটবে।

লাউঘাটিতে দুই পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়ায়। দেবনাথ রায় এসেছে ঘোড়ায় চড়ে। গুরু হয় তুমুল লড়াই। নিহতের রক্তে লাল হয়ে উঠে মাটি। ইছামতির পানিও লাল তরঙ্গ তোলে। আহতদের আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

দেবনাথ রায় কৌশলী যোদ্ধা। তিতুমীরের দলের খিদির খাঁকে সে ভয়ানকভাবে জখম করে। তার তরবারির আঘাতে খিদির খাঁর বাম বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

আহত খিদির খাঁ লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তার মুখ থেকে কোন আর্তনাদ বেরুল না। মাটিতে পড়েই সে তার ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল লাঠিটি। সজোরে আঘাত করল দেবনাথ রায়ের ঘোড়ার পায়ে। ঘোড়া চিহি আর্তরব করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। আর তার দেহের নিচে পড়ল দেবনাথ রায়ের পা। এ সময় ছুটে এলেন এক মুজাহিদ। হাতের লাঠি ফেলে তিনি কুড়িয়ে নিলেন দেবনাথের তলোয়ার। সক্রোধে বললেন : এই তলোয়ার দিয়ে তুই অনেক মজলুমের রক্ত বারিয়েছিস। এবার তোর হিসাব দেয়ার পালা।

তিনি তলোয়ার উচিয়ে ধরেন। মুহূর্তে দেবনাথের মাথা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দেবনাথ নিহত। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তার দলবল।

মুজাহিদরা বিজয়ী হয়।

কিন্তু তাঁদের মধ্যে বিষাদের ছায়া। তিতুমীর কোথায়? তিনি কি শহীদ হয়েছেন?

তাঁরা তাকান সামনের প্রান্তরে। এখনো সেখানে রক্তের উষ্ম ধারা। প্রান্তরে উঠে দাঁড়ান তিতুমীর। রক্তাপ্ত।

মুজাহিদদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায় : না তিতুমীর মরেননি। তিনি বেঁচে আছেন।

তিতুমীর এসে দাঁড়ান তাঁর বন্ধুদের মাঝে। বলেন : মুজাহিদ কখনো মরে না। এ প্রান্তরে আমাদের যেসব মুজাহিদ-বন্ধু শুয়ে আছেন তাঁরা শহীদ। তাঁরা শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জীবনকে জাগিয়ে গেছেন।

সাহেবদের পরাজয়ের গ্লানি

তিতুমীরের নাম শুনেই পিলে চমকে ওঠে জমিদারদের। নীলকর সাহেবদের। এমনকি খোদ কোম্পানি-সরকারের। গ্রাম উজাড় করে লোকজন এসে জমায়েত হল তিতুমীরের দলে। তিতুমীরের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। প্রায় এক হাজার যুবককে লাঠি, তরবারি, বল্লম দিয়ে সজ্জিত করে তিতুমীর সার্বক্ষণিক একটি বাহিনী গঠন করলেন। এ বাহিনী যে কোন হামলা ও যুদ্ধের জন্য সবসময়ই প্রস্তুত থাকে। তিতুমীর জমিদারদের খাজনা দেয়ার হুকুম করছিলেন আগেই। এখন অত্যাচারী তালুকদার, মহাজন, নীল কুঠেল, ধনবান ব্যক্তি-তাদেরকে স্বভাব বদলানোর নির্দেশ দিয়ে তিতুমীর চিঠি পাঠালেন। চিঠি পেয়ে স্বভাব বদলাল না অত্যাচারী প্রজা-পীড়ক দল। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গা ঢাকা দিল। আর গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করল। কিভাবে তিতুমীর আর তাঁর বাহিনীকে শেষ করে দেয়া যায়, সে জন্য। তিতুমীরের আহ্বানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সব প্রজা জমিদারদের খাজনা দেয়া বন্ধ করল। নীল

কুঠেলের হুকুম উপেক্ষা করে নীল চাষও বন্ধ হল। অনেক জায়গায় নীল কুঠেলরা জুলুম করে নীলের চাষ করাতে গিয়ে সংঘবদ্ধ প্রজাদের বাধার সম্মুখীন হয়ে পালাতে বাধ্য হল। জমিদার আর কুঠেলরা নদীয়া ও বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে তিতুমীরের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল। এরপর বাংলার ছোট লাট সাহেবের কাছে আবেদন জানাল, কোম্পানির নিয়মিত সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে তিতুমীরকে দমনের ব্যবস্থা নিয়ে অনুগত জমিদার ও নীল কুঠেলদেরকে রক্ষা করার মর্জি হোক।

ছোট লাট সাহেব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিতুমীরের তৎপরতার খবর আগেই কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল। তাঁর নির্দেশে কলকাতা থেকে এক সিপাহী দল যশোর জেলার বাগান্তির নিমক পোক্তানে এসে শিবির স্থাপন করল। বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের উপর নির্দেশ এল, তিনি যেন বাগান্তিতে গিয়ে সিপাহী দলের সাথে যোগ দেন। আলেকজান্ডার বসিরহাটে এলেন। তিনি সেখানকার থানার দারোগা ও বরকন্দাজদের নির্দেশ দিলেন, লড়াইয়ের সময় তারা সিপাহীদের সাথে যোগ দিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করবে। এই আয়োজন সম্পাদন করে আলেকজান্ডার বাগান্তিতে গেলেন।

১৫ নভেম্বর। ১৮৩০। আলেকজান্ডার একজন হাবিলদার, একজন জমাদার ও বিশজন সিপাই নিয়ে তিতুমীর ও তাঁর দলবলকে শায়েস্তা করতে চললেন। এই বাহিনী বাদুড়িয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হল। এ সময় এখানে এসে বসিরহাট থানার দারোগা কুখ্যাত রামরাম চক্রবর্তী ও বরকন্দাজরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। তিতুমীরের বিরুদ্ধে বাহিনীটির লোকসংখ্যা দাঁড়ায় এক শ' বিশ জন। প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক।

ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ-প্রস্তুতির খবর তিতুমীর আগেই পেয়েছিলেন। তিনিও তাঁর সাথীদের নিয়ে প্রস্তুত হলেন।

আলেকজান্ডার তাঁর সেনাদল নিয়ে নারিকেলবেড়ের প্রবেশ-মুখে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি চেয়েছিলেন হঠাৎ তিতুমীরের বাহিনীর উপর চড়াও হয়ে তাঁদেরকে পরাজিত করবেন। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, পাঁচ শ' মুজাহিদ ইংরেজ বাহিনীকে মুকাবিলা করার জন্য অপেক্ষা করছেন। তাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিতুমীরের ভাগ্নে মাসুম। তিনি একটি তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়েছেন। তরবারি আর বল্লমে সজ্জিত। ইংরেজ বাহিনীকে দেখেই মুজাহিদরা সম্মিলিত স্বরে গর্জে উঠল আত্মাহুত আকবর।

আলেকজান্ডার প্রতিপক্ষের প্রস্তুতি দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বাক-চাতুর্যের কৌশল অবলম্বন করে কালক্ষেপণের মতলব নিয়ে এগিয়ে এলেন। মুজাহিদরা তাঁকে সে সুযোগ দিলেন না। তাঁরা দূরন্ত বেগে ধেয়ে এলেন ইংরেজ বাহিনীর দিকে। আলেকজান্ডার ভীত হয়ে তাঁর বাহিনীকে গুলি ছোঁড়া নির্দেশ দিলেন। গর্জে উঠল বন্দুক। এতে আরো ক্ষীণ হয়ে উঠলেন মুজাহিদরা। মরণ-পণ করে তাঁরা ছুটে এলেন। ইংরেজ সিপাইরা আর দ্বিতীয়বার গুলি করার ফুরসত পেল না। তাদের উপর অবিরাম ধারায় ইট ও পাথর পড়তে লাগল। এতে অনেক সিপাই আহত হল। এভাবে ইংরেজ

বাহিনীকে কাবু করে মুজাহিদরা তরবারি কোষমুক্ত করলেন। উঁচিয়ে ধরলেন বল্লম। এই হামলায় একজন জমাদার, দশজন সিপাই ও তিনজন বরকন্দাজ নিহত হল। আহত হল অনেকেই। আলেকজান্ডার অবস্থা বেগতিক দেখে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। প্রাণ বাঁচানোর জন্য পলায়নের পথই উত্তম বলে মনে করলেন। তাঁকে পালিয়ে যেতে দেখে মুজাহিদরা উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠলেন।

আলেকজান্ডার আরো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর ঘোড়া ছোটালেন। কোন্ পথে ঘোড়া ছুটছে, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। ঘোড়াও বিপদ দেখে প্রাণপণ ছুটতে লাগল। ঘোড়া ছুটতে ছুটতে ভড়ভড়িয়ার খালে এসে পড়ল। কাদায় গঁথে গেল তার চারটি পা-ই। ঘোড়া আর ছুটতে পারল না। আলেকজান্ডার যত চাবুক কষেন, ঘোড়া ততই আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু কাদা থেকে আর উঠতে পারে না। আলেকজান্ডারের বুক ভয়ে আরো ধরফড় করে ওঠে। সারা শরীরে কাদায় মাখামাখি হয়ে আলেকজান্ডার খালের পাড়ে এসে শুয়ে পড়েন। মূর্ছগ্রস্তের মত সেখানে পড়ে থাকেন। কলিঙ্গ গ্রামের কয়েকজন ব্রাহ্মণ তাঁর এই করুণ অবস্থা দেখে তাঁকে ধরাধরি করে তাদের গ্রামে নিয়ে যায়। পরে তিনি সুস্থ হলে তাঁকে বাগান্তির ইংরেজ সিপাহীদের শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই সংঘর্ষে ইংরেজদের বশংবদ ভৃত্য দারোগা রামরাম চক্রবর্তীও নিহত হয়।

এই নিদারুণ পরাজয় ইংরেজ মহলে আলোড়ন তুলল। তিতুমীরকে দমন না করতে পারলে এখান থেকেই সৃষ্টি হতে পারে ইংরেজ রাজত্বের অবসান। আরো বড় বাহিনী, প্রয়োজনে সামরিক বাহিনী পাঠাতে হবে। এদিকে সাতক্ষীরা, গোবরডাঙ্গা, নদীয়াসহ বিভিন্ন এলাকার বড় বড় জমিদাররা আবেদন জানাল জমিদার, নীলকর ও কোম্পানির যৌথ বাহিনীর অভিযান প্রেরণের জন্য।

গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কও এই ঘটনায় বিচলিত। তাঁর নির্দেশে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্থিতি কয়েকটি হাতি ও অনেক সৈন্য নিয়ে স্থলপথে ও নৌপথে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে যোগ দেন নীলকর ডেভিড এড্জুজ। নদীয়া ও গোবরডাঙ্গার জমিদারগণও তাঁদের পাইক-বরকন্দাজদের নিয়ে ইংরেজ বাহিনীর সাথে যোগ দেয়।

তিতুমীরের সেনাপতি ও ভাগ্নে মাসুম আগেই এ বাহিনীর খবর পেয়েছিলেন। তিনি মুজাহিদদের নিয়ে ভাগারিয়ায় উপস্থিত হন। সেখানকার পরিত্যক্ত নীলকুঠি দখল করে সেখানেই অবস্থান নেন। স্থিতি বাঘারিয়ায় এসে উপস্থিত হন। তিনি পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে মুজাহিদদের উপস্থিতির খবর পেয়ে তাঁর সৈন্যদের আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। ইংরেজ-জমিদারদের মিলিত বাহিনী মুজাহিদদের অবস্থান লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ শুরু করে।

নীল কুঠির ভেতরে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন মুজাহিদগণ। তাঁরা ভেতর থেকে ইংরেজ বাহিনীর উপর ইট-পাথর ও বেল নিক্ষেপ শুরু করেন। অজস্র ধারায়

এই বর্ষণের ফলে ইংরেজ বাহিনী ব্যাপকভাবে আহত হতে থাকে। তারাও পাগলের মত গুলিবর্ষণ করতে থাকে।

মুজাহিদরা কুঠির আড়ালে থাকায় গুলিবর্ষণে তাঁদের তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইংরেজ-বাহিনী মুজাহিদদের আক্রমণে ছত্রস্থান হয়ে পড়ে। স্থিথ উপায়ান্তর না দেখে তাঁর বাহিনীকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি ও ডেভিড গিয়ে উঠলেন বজরায়। ইংরেজ সিপাইদের পালাতে দেখে জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজরাও রুদ্ধশ্বাসে পালাতে লাগল। তখন মুজাহিদরা উন্মুক্ত তরবারি ও বল্লম হাতে কুঠি থেকে বেরিয়ে এসে পলায়নপর সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালান।

এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বহু হতাহত হয়। মুজাহিদরা একটি হাতি ও কয়েকটি বন্দুক হস্তগত করেন।

আবহমান প্রাণস্পন্দন

গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক এবার সত্যি সত্যি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তিতুমীর ও তাঁর দলবলকে দমন করার জন্য একজন কর্নেলের নেতৃত্বে দু'টি কামানসহ একশ' গোরা সৈন্য তিন শ' দেশী সিপাই পাঠালেন। সাথে যোগ দিল আরো বহু সশস্ত্র কুলি। তারা নারিকেলবেড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

এই বাহিনী বাদুড়িয়াগঞ্জে উপস্থিত হল। কর্নেল নারিকেলবেড়ে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য অশ্বারোহী দু'জন লোক পাঠালেন।

মুজাহিদগণ অশ্বারোহী দু'জন দেখেই তাদেরকে ইংরেজদের চর হিসেবে সনাক্ত করে ফেললেন। দু'জনকেই তাঁরা ভাড়া করলেন। বেগতিক দেখে অশ্বারোহী দু'জন পালাতে লাগল। একজন ছুটন্ত অবস্থায় এক গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে গেল। তাকে ধরে ফেললেন মুজাহিদরা।

অন্যজন সঙ্গীর কি হল, সেদিকে জ্রক্ষেপ না করে বাদুড়িয়ার দিকে পালিয়ে গেল এবং কর্নেলের কাছে নারিকেলবেড়ের ঘটনা রং লাগিয়ে পরিবেশন করল। এতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কর্নেল। সাথে সাথেই তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে নারিকেলবেড়ের দিকে ধাওয়া করলেন। সন্ধ্যায় তারা নারিকেলবেড়ের গ্রাম ঘেরাও করে ফেলল।

বাঁশের কেলায় খবর পৌঁছে গেল, ইংরেজ সেনাদল এসে গিয়েছে। ভোর বেলাই আক্রমণ করবে কেলা।

মুজাহিদরা রাতেই ইংরেজ বাহিনীর উপর ইট-পাথর ও বেল বর্ষণ করে আক্রমণ শুরু করলেন। এতে ইংরেজ বাহিনীর সিপাইরা আহত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে।

১৪ নভেম্বর। ১৮৩১।

ভোর বেলা। বাঁশের কেলায় ফজরের নামাজ আদায় করলেন মুজাহিদরা। তিতুমীর তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন : আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য আমাদের এই সালাত। আল্লাহর জমিনের উপর এই সালাত কায়েম করার জন্যই আমরা জেহাদ করছি। হয়তো এই জেহাদে আমরা শহীদ হব। আমাদের শাহাদাতের রক্তে জ্বলে উঠবে হিন্দুস্থানের হকপন্থী ঈমানদার লোকদের আশার প্রদীপ। এই জেহাদ জারি থাকবে। যতদিন পর্যন্ত এ জমিনে একজন ঈমানদারও জীবিত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত মজলুমের পক্ষে, হকের পক্ষে, ইংরেজ ও বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদ চলবে।

মুজাহিদগণ আল্লাহ আকবর ধ্বনি তুলে তাঁর বক্তব্যের সাথে একমত ঘোষণা করলেন।

কর্নেল সাহেব এগিয়ে এলেন বাঁশের কেলায় দিকে। তিনি একটি ঘোড়ার পিঠে চড়েছেন। কেলায় প্রধান ফটকের সামনে এসে তিনি তাঁর ঘোড়া থামালেন। পকেট থেকে বের করলেন একটি শ্রেফতারি পরোয়ানা। সেটি তাঁর তলোয়ারে গেঁথে উচ্চস্বরে বললেন জনাব, হিন্দুস্থানের মহামান্য গভর্নর জেনারেল আপনাকে সদলবলে শ্রেফতার করার জন্য পরোয়ানা দিয়েছেন। আপনি স্বেচ্ছায় শ্রেফতার হবেন কিনা জানতে চাই।

কর্নেল দু'বার শ্রেফতারি পরোয়ানাটি পড়লেন। তিনি কেলায় ভেতর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলেন। মুজাহিদরা তাঁকে আক্রমণ করে এই শ্রেফতারি পরোয়ানার জবাব দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এরপর তিনি তাঁর বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা কেলা ঘিরে ফেলে পজিশন নিল।

ইংরেজরা কেলা ঘিরে ফেলেছে। তারা মুজাহিদদের ঢিল ছোঁড়ার নাগালের মধ্যেই। দেখতে পেয়ে তিতুমীর মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে বললেন আল্লাহর পথের মুজাহিদ ভাইসব, আজ আমাদের জন্য সুবর্ণ সময়। হয় আমরা জেহাদে গাজী হব, ইংরেজদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করব, মজলুমের রাজত্ব কায়েম করব। না হয় আল্লাহর পথে শহীদ হব। ঈমানদারদের জন্য এই গৌরবোজ্জ্বল সময় মহামুক্তির পয়গাম নিয়ে আসে। মুজাহিদ কাপুরুষের মত মরতে জানে না। বীরের মত লড়তে লড়তে সে তার প্রাণ আল্লাহর রাহে কুরবানি দেয়। আমরাও আমাদের জীবন কুরবানী দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করব।

গুরু হল যুদ্ধ। ইংরেজদের গুলিবর্ষণ মুজাহিদদের স্পর্শ করতে পারল না। তাঁরা পাণ্টা ইট-পাথর, বেল বর্ষণ করতে লাগলেন। মুজাহিদদের অব্যর্থ আক্রমণে ইংরেজ-বাহিনীতে ব্যাপক হতাহতের আত্ননাদ তীব্র হয়ে উঠল।

কর্নেল বুঝলেন, এভাবে যুদ্ধে তাঁকে পরাজয়ের দুর্ভাগ্যই বহন করতে হবে। তিনি কামান আনতে বললেন।

কামান থেকে প্রথমে ফাঁকা গোলাবর্ষণ করা হল। কর্নেল আশা করেছিলেন, কামানের গোলার শব্দে ভীত-শংকিত হয়ে মুজাহিদগণ আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু উল্টো ফল হল। এ শব্দে মুজাহিদগণ আরো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। কর্নেল এবার পুরোপুরি কামান-যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দিলেন।

মুহুর্মুহ কামানের গোলা বর্ষণের বিকট শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল। বাঁশের কেলা খরখর করে কেঁপে উঠতে লাগল। কেলায় একপাশ হেলে ধসে পড়ল। কেলায় নিচে চাপা পড়ে, কামানের গোলায় মুজাহিদদের অনেকেই হতাহত হলেন।

কিন্তু কর্নেল বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, এতে যেন মুজাহিদরা আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠছেন। মৃত্যু যাঁরা আলিঙ্গন করবেন বলে পণ করেছেন, তাঁদেরকে কর্নেল ভীত ও পরাজিত করবেন কি দিয়ে?

কামানের একটি গোলা তিতুমীরের কাছাকাছি পড়ল। গোলার আঘাতে তিতুমীরের ডান উরু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তিনি মাটির উপর পড়ে গেলেন। তখনও তাঁর চোখ-মুখ উদ্ভাসিত, উজ্জ্বল—জেহাদের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত। তিনি মুজাহিদদের সম্বোধন করে বললেন: বাঁশের কেলায় আগুন জ্বলছে। আগুন জ্বলছে ফরিদপুরে। আগুন ছড়িয়ে গেছে সারা দেশে। নারিকেলবেড়ের পতন হলেও জেহাদ শেষ নয়। তোমাদের জেহাদ চলছে। আজীবন চলবে।

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মুজাহিদ তিতুমীর শাহাদাত বরণ করলেন। মুজাহিদদের অনেকেই শহীদ হলেন। অনেকেই হলেন আহত। বন্দী হলেন আটশ' জন। অনেকেই পালিয়ে গেলেন নতুন করে জেহাদের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য।

দীর্ঘ বিচারের প্রহসনের পর এক শ' চল্লিশ জন মুজাহিদকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। সেনাপতি মাসুমকে দেয়া হয় প্রাণদণ্ড। তিনি অমান বদনে প্রাণদণ্ড বরণ করেন।

বাঁশের কেলা বিধ্বস্ত হয়। সেখানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু নারিকেলবেড়ের কেলায় সে আগুন জ্বলতে থাকে আবহমান কাল ধরে।

তৃতীয় পর্ব

শ ম সে র গা জী



ভূমিদাস

রাজা যায়। রাজা আসে। নতুন যে রাজা আসে সাথে করে নিয়ে আসে নতুন খাজনা। নতুন পীড়ন, নতুন অত্যাচার। আর প্রজাদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

ত্রিপুরা জেলা। রোশনাবাদ পরগনা।

এই পরগনাতেই জন্ম নিয়েছেন শমসের গাজী। দীন-দরিদ্র কৃষকের ঘরে।

আসলে শমসের গাজীর পরিবার এমন করুণ অবস্থায় আগে কালাতিপাত করেনি। আলিবর্দি খাঁ ও সিরাজদ্দৌলার নবাবী কালে তারা ছিল সম্পন্ন কৃষক। ভাত-কাপড়ের কোন অভাব নেই। নবাবের বা তাদের প্রতিনিধিদের কোন অত্যাচার নেই। বাড়তি খাজনার বিড়ম্বনা নেই। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ সবাই।

দুর্ভাগ্যের সূচনা হয় স্বাধীনতা হরণের পর থেকেই। বেনিয়া ইংরেজ দফায় দফায় তাদের রাজস্ব আয় বাড়িয়ে বাংলা লুঠের সবগুলো ফিকিরই করে। প্রজা বা রায়ত সাধারণের গোলা থেকে ধান-চাল বের করে চড়া খাজনা আদায় করে। যে পারে না খাজনা শোধ করতে, তার উপরই নেমে আসে অত্যাচার।

স্বাধীন নবাবদের সময় রোশনাবাদ পরগনার রাজস্ব ছিল ৩৩ হাজার ৩শ' ৫ টাকা। ইংরেজরা এ রাজস্ব তিন গুণ বাড়িয়ে প্রথমে ধার্য করে ১ লাখ টাকা। পরে খাজনা আরো বাড়িয়ে করা হয় ১ লাখ ৫ হাজার টাকা।

খাজনা বাড়ানো নিয়ে জমিদার আর তালুকদারদের কোন খেদ নেই। এ টাকা তো তাদেরকে আর নিজের ট্যাক থেকে শোধ করতে হচ্ছে না। দেশে কেমন যেন এক অরাজক অবস্থা। এ অবস্থার পুরো সুযোগ নিচ্ছে জমিদার-তালুকদাররা। যে যার মত তারা প্রজাদের ঘাড় মটকে খাজনা আদায় করছে। এর কিছু অংশ নিজেদের পকেটে ভরছে। আর কিছু দিচ্ছে ইংরেজদেরকে। এভাবেই দেশের কৃষকদের অবস্থা দিনকে দিন শোচনীয় হতে থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যের শোষণ আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কৃষকরা তাদের জমি হারাতে থাকে। নিজেদের ভিটায় টিকে থাকাই তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। উপায় না দেখে কেউ কেউ পালিয়ে যায় বনে। এসময়ই ভূমিদাস প্রথা চলতে থাকে জোরেশোরে। অনেক কৃষক দু'মুঠো ভাতের আশায় সম্পন্ন গৃহস্থ বা জোতদারদের কাছে নিজেদের ছেলে-মেয়েদেরকে বিক্রি করে। কেউ আবার নিজেই বিক্রি হয়ে যায়। দাসত্বের জীবনই যেন ভাল, অন্তত খেয়ে-পড়ে তো বেঁচে থাকা যায়।

এমনি দুর্ভোগের কবলে পড়েছে শমসের গাজীর পরিবার।

অভাবে অভাবে শমসেরের পিতা দিশেহারা। কিভাবে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে বুঝেই উঠতে পারছে না। সোনার টুকরো জমিগুলো একের পর এক পেটের ভেতর চলে যাচ্ছে। পেটের ভেতরেই তো। জমি বেচার সব টাকা যায় রাঙ্কুসী পেটের জন্য খাবার-দাবার যোগাড় করতে।

একদিন বাবা-মা নিজেদের মধ্যেই আলোচনায় বসেন। ছেলেমেয়েরা খাবার-দাবারের জন্য কান্নাকাটি করছে। নিজেদেরও খাওয়া হয়নি অনেকদিন থেকে। এভাবে আর ক'দিন চললে গাঁয়ের রাস্তায় কঙ্কালসার লাশ পড়ে থাকবে। গায়ে গোস্ত চর্বি নেই বলে ন্যাড়ি কুকুর কেন শকুনও ফিরে তাকাবে না।

বাবা বললেন আমি পুরুষ মানুষ। সংসারের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমারই। কিন্তু কিভাবে করব? হালচাষ ছাড়া তো আর কোন কাজ জানি না।

মা বললেন হালচাষ করবে কি দিয়ে? হাল নেই। জোয়াল নেই। লাঙ্গল নেই। বলদ নেই।

: হালচাষ করব যে জমিতে সে জমিই-বা কোথায়? সব তো গেছে জমিদার ত্রিপুরা রাজা আর ইংরেজদের পেটে।

তাহলে কি করবে? ছেলেমেয়েদের মুখে তো অন্তত ভাত দিতে হবে। মা হয়ে ওদের ক্ষুধার জ্বালায় কান্নাকাটি আর সহ্য হয় না।

তাহলে কি বনে যাব? পাড়া-পড়শিরা যেমন যাচ্ছে।

বনে গিয়ে খাব কি?

সবাই যা খাচ্ছে। ফলমূল। বন থেকে বেরিয়ে ডাকাতি।

বনে বসবাস আমাদের ধাতে সইবে না। ডাকাতি করতেও পারব না।

তা হলে কি করব? না খেয়েই মরব?

আর করতে পারি একটা কাজ। ধনী লোক কারো কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিতে পারি। দাস হলে তো আমার আর খাওয়া-পরার সমস্যা থাকবে না। আমাকে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে, তা নিয়ে তোমরা খেয়ে-পরে বাঁচবে।

টাকা ফুরোলে তারপর? তুমিও থাকবে না। আয়-রোজগার করবে কে?

এবার এগিয়ে এলেন বালক শমসের। বললেন আব্বাজান, আপনি চলে গেলে তো আমাদের সংসারটাই অন্ধকার হয়ে যাবে। তার চাইতে আমাকে বিক্রি করুন। যে টাকা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে নতুন করে জমি-জিরেত করুন। হাল-চাষ করুন।

মা শমসেরকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন আমার চোখের মণিকে তুলে দেব আরেকজনের হাতে! আমার চাই না টাকা। চাইনা জমি-জিরেত। না হয় না খেয়েই মরব।

শমসের বললেন এটা কোন কাজের কথা হল না। আমার এখনো অনেক বয়স আছে। আমি বড় হব। আমার গায়ে তাকত হবে। আমি সময় হলে নিজেকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিতে পারব। আমাকে নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। এখনকার সমস্যা এখনি মিটিয়ে ফেলেন। ভবিষ্যতে আমার ভাগ্য আমিই গড়ে নেব।

মা-বাবা আর ছেলের মধ্যে অনেকক্ষণ বিতণ্ডা হয়। মা কাঁদলেন। বাবাও কাঁদলেন। কিন্তু ছেলে শক্ত মনের মানুষ। অতটুকু ছেলে হয়েও তাঁর চোখে পানি এল না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। শেষ পর্যন্ত ছেলেই বিজয়ী হলেন।

দক্ষিণ শিকের জমিদার নাসির মহম্মদ। প্রতাপশালী জমিদার। তার কাছেই নিয়ে আসা হল শমসের গাজীকে।

নাসির মহম্মদ একটা দাম ধরে শমসের গাজীকে কিনে নিলেন। বললেন এখন থেকে তুই আমার কেনা গোলাম। ক্রীতদাস। আমি যা হুকুম করব। সব কাজই তোকে করতে হবে।

বালক শমসের শির উঁচু করে বলল : আমিও জানি। আজ থেকে আমি আপনার গোলাম। মাটির মানুষ আমরা। তাই ভূমি দাস বলতে পারেন। তবে হুজুর, আমার একটা কথা। আমরা ক্রীতদাস হই আর ভূমিদাস, আমরাও মানুষ। আমরাও আপনার কাছ থেকে মানুষের মত আচরণই কামনা করি।

নাসির মহম্মদ বিস্মিত হয়ে বালক শমসেরের দিকে তাকালেন।

কৃষক সেনাদল

শমসের নাসির মহম্মদের বাড়িতে বেড়ে ওঠেন। ভূমিদাস হিসেবে তাঁর জীবন শুরু। অসাধারণ শারীরিক শক্তি। তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। এ দু'য়ের সমন্বয়ে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

মুখ্য জমিদার নাসির মহম্মদ শমসেরকে এক কুতঘাটের তহশীলদার হিসেবে নিযুক্ত করেন।

কিন্তু শমসের গাজীর মনে শান্তি নেই। তাঁর অতীত স্মৃতি তাঁকে বারবার খুঁচিয়ে যায়। তিনি দেখেন তাঁর বর্তমানকে। প্রজাদেরকে। কৃষকদের অবস্থা। দেখে দেখে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন।

জমিদারদের জমিও নেই, জিরেতও নেই। কিন্তু ভাবটা এমন যেন সব প্রজার জমিই তাদের জমি। কৃষকরা ফসল ফলায়। কুমোররা হাঁড়ি-পাতিল বানায়। তাঁতীরা তাঁত বোনে, কাপড় বানায়। জেলেরা সারা রাত জেগে মাছ ধরে। মাঝিরা উত্তাল নদীর বুকে নৌকা বেয়ে যাত্রীদের পারাপার করে। ব্যবসায়ীরা বাজারে বাজারে ঘুরে মাল-সামান বিকিকিনি করে। সব মানুষের কাজ রয়েছে। নিজেরাই নিজেদের জন্য রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু কোন কাজ নেই জমিদারদের। পরের ধনেই তাদের পোন্দারি। তারা পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে। বাগানবাড়িতে ফুটি করে। খাবারে তাদের কোন ঘাটতি নেই। মনে যখন যা ইচ্ছে করে তখন তাই দিয়ে উদরপূর্তি করে।

কিন্তু এগুলোর জন্য যে টাকা-পয়সা লাগে তা অন্যদের মত কষ্ট স্বীকার করে তাদেরকে আয় করতে হয় না। সব প্রজাই তাদের পায়ের তলায় খাজনা দিয়ে যায়। নজরানা দেয়। কেউ যদি দিতে না পারে তাহলেই সমস্যা হয়। জোত-জমি বাজেয়াপ্ত

করা হয়। ধান-চাল-ফসল যা পাওয়া যায় সব ক্রোক করা হয়। এমনকি হাড়ি-পাতিলও। প্রয়োজনে ভিটে মাটি দখল করে প্রজাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

প্রজাদের কষ্ট শমসের গাজী আগে অতখানি বোঝেননি। কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর স্মৃতিতে দগ্ধ হয়ে ছিল বাল্যকালের তীব্র ক্ষুধার কথা। ক্ষুধার জ্বালায় তাঁদের পুরো পরিবারটাই বিপর্যস্ত হয় পড়েছিল। আর এর থেকেই রেহাই পেতে তাঁকে বিক্রি হয়ে আসতে হয়েছে জমিদার বাড়িতে।

সারা দেশে যখন অভাব তখনো জমিদার বাড়িতে মৌ-মৌ করে সুখ। এত সুখ আসে কোথা থেকে? রায়তদের রক্ত নিংড়েই জন্ম নেয় জমিদারদের সুখ। জমিদারদের হাসির অন্তরালে লুকিয়ে আছে সাধারণ প্রজাদের কান্না।

শমসের গাজী খুব মনোযোগ দিয়ে এগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর এখন কুত ঘাটের তহশীলদার হয়ে আরো বেশি করে দেখতে পাচ্ছেন।

শমসের গাজী ভাবলেন, বাল্যকালে যখন তাদের পরিবারে ভাতের অভাব নেমে এসেছিল, এ অভাব তো তাঁদের নামার কথা ছিল না। তবু কেন অভাব? জমিদারের খাজনা আর অন্যান্য দাবী মেটাতে গিয়েই তো অন্যান্য কৃষকের সাথে সাথে তাদের জীবনেও দেখা দিয়েছিল অভাব। জমিদারদের সিপাই-সান্ঠী একে একে প্রজাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। জমিদারের জুলুমবাজ বাহিনীর ভয়ে তারা বনে-বাদাড়ে পালিয়েছে। না হলে নিজেদেরকে বিক্রি করে সারা জীবনের জন্য দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

তবু কেন প্রজারা জমিদারদের অন্যান্য অত্যাচার জুলুমবাজির প্রতিবাদ করেনি?

এই শমসের তাঁর বাল্যকালে কি করেছিলেন প্রতিবাদ? কিংবা প্রতিবাদ জানিয়েছিল তাঁর পরিবার?

আসলে কেউ প্রতিবাদ জানায়নি। প্রতিবাদ জানানোর সাহসও পায়নি। জমিদারকে ভয়। তার বাহিনীকে ভয়। তার অত্যাচারের ভয়। তার নির্দয়তাকে ভয়। আর এমন প্রতিবাদ যে এক-আধবার হয়নি, তাও নয়। কেউ কেউ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছিল। তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করা হয়েছে। শেষ করে দেয়া হয়েছে।

শমসের ভাবলেন, প্রজার সংখ্যা বেশি। তারাই অত্যাচারিত। জমিদারের সংখ্যা কম। তাদের লোকজনও কম। তারাই অত্যাচারী। সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘিষ্ঠের অত্যাচার। এটা সম্ভব হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অত্যাচারিত প্রজারা সচেতন নয়। ঐক্যবদ্ধ নয়। এরা যদি সবাই সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ায়, জমিদার আর তাদের লোকজন পালানোর পথ-ঘাট খুঁজে পাবে না। আর মুক্তির তো এই একটাই পথ।

শমসের তাঁর বয়েসী যুবক প্রজাদের বোঝাতে লাগলেন। ঐক্যবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব বোঝালেন। সংঘ-শক্তির মাহাত্ম্য বোঝালেন।

প্রজারা নিজেদের মনে সাহস ফিরে পেতে শুরু করল। তাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হল। উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। শমসের তাদের নিয়ে ধীরে ধীরে দল গড়তে শুরু করলেন। গড়ে উঠল শমসের গাজীর কৃষক সেনাদল।

অভিনব বিদ্রোহ

শমসের তাঁর কৃষক সেনাদলের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন। জমিদারদের শোষণ আর চলতে দেয়া যায় না। মেনে নেয়া যায় না পুতুল নবাবদের শাসন। সহ্য করা যায় না বেনিয়াদের লুণ্ঠন।

গরীবের দুঃখ বোঝে গরীবরাই। প্রজার দুঃখ বোঝে প্রজা। সুতরাং এদেশের শাসনে জমিদার থাকবে না। পুতুল নবাব থাকবে না। বেনিয়া ইংরেজ থাকবে না। কায়ম করতে হবে কৃষকদের শাসন। কৃষকরাজ।

সবই ঠিক। তবে কিভাবে শুরু করা যায়?

প্রথম বিদ্রোহ হবে জমিদার নাসির মহম্মদের বিরুদ্ধে।

নাসির মহম্মদ অনেক বড় বড় ভাল ভাল কথা বলে ভাল মানুষ সাজেন। কিন্তু ভাল মানুষের মুখোশের আড়ালে তার শোষণ-নিপীড়ন অভ্যচার-অবিচার বেড়ে গিয়েছে বহু গুণ। সাধারণ মানুষদের সামনে তাঁর এই মুখোশটি সবার আগে খুলে ফেলত হবে। দেখিয়ে দিতে হবে তাঁর আসল চরিত্র।

শমসের তাঁর লোকদের সাথে চুপি চুপি শলাপরামর্শ করলেন। বের করলেন অভিনব বিদ্রোহের কৌশল।

শমসের সদলবলে জমিদার নাসির মহম্মদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। অসময়ে তহশীলদারকে দলবল নিয়ে কাছারিতে আসতে দেখে জমিদারের সন্দেহ হল। কিন্তু তিনি তাঁর সন্দেহের কথা কাউকে জানানেন না। হাসি মুখে সবাইকে অভ্যর্থনা জানানেন। শমসেরকে সম্বোধন করে বললেন আরে শমসের, এসো এসো। তোমার তহশীলে খাজনা আদায় ঠিকমতই হচ্ছে তো?

শমসের ঘুরিয়ে জবাব দিলেন কৃষকের খাজনা। রায়তের খাজনা। এ খাজনা মাফ করা যায় কিভাবে?

একটু সন্দেহ দেখা দিলেও জমিদার তাঁর মুখের হাসি বহাল রেখে বললেন তোমাকে নিয়ে আমার কোন চিন্তা নাই। সেই ছোটবেলা থেকে তোমাকে লালন-পালন করেছি। বড় করেছি। আজ গুরুদায়িত্ব দিয়েছি। দায়িত্ব তুমি যথাযথভাবে পালন করবে। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই।

আল্লাহ চাহেন তো আমার দায়িত্ব আমি ঠিকমতই পালন করব। আমার প্রতি কি আপনার স্নেহ রয়েছে?

অবশ্যই।

: আপনার স্নেহের দাবী নিয়েই আজ আমরা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আশা করি আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলে কবুল করবেন। আমরা মুসলমান। আপনি মুসলমান। আমি মুসলমান। আমার যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে নিশ্চয়ই আপনার কোন সন্দেহ নেই।

না, নেই। কিন্তু তোমার প্রস্তাবটা কি?

ইসলাম ধর্মে মানুষে মানুষে কোন তফাত নেই। কোন শ্রেণী বিভেদ নেই। একজন যোগ্য মানুষ হিসেবে আমি আপনার বিবাহযোগ্য। মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

শমসেরের ধুষ্টতায় নাসির মহম্মদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ-মুখ প্রচণ্ড রাগে গরম হয়ে উঠল। তিনি হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন : আমি জমিদার। শমসের তুই ভুলে যাস না তুই আমার আশ্রিত কেনা গোলাম। ভূমিদাস। তোর এই দুঃসাহসের শাস্তি আমি তোকে এখনি দেব।

শমসের তাঁর বুক টান টান করে দাঁড়ালেন। শির উঁচু করে বললেন : মানুষ কেউ কারো গোলাম নয়। আমাদেরই লুপ্তিত টাকা দিয়ে আপনি আমার মত লোকদের কিনে এতদিন গোলাম বানিয়েছিলেন। আমরা জানে-প্রাণে খেটে আপনার সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা যদি না থাকি, তাহলে আপনিও থাকতে পারবেন না। আপনার জমিদারীও থাকবে না। আর কার বিচার আপনি করতে চাইছেন? আমাদের?—সে দুঃস্বপ্ন ভুলেও দেখবেন না। আজ থেকে তো আপনার বিচারই শুরু হয়ে গিয়েছে। কৃষক প্রজাদের লুণ্ঠ করে এ পর্যন্ত যা নিয়েছেন, তা কড়ায়-গুণ্ডায় শোধ করতে হবে।

ইতোমধ্যে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজরাও অস্ত্র উঁচিয়ে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শমসেরের লোকরাও প্রস্তুত।

শমসের বললেন : আজকের মত আমরা যাচ্ছি। তবে আমরা আবার ফিরে আসব।

শমসের গাজী সদলবলে জমিদারের এলাকা ছেড়ে গভীর বনে চুকে গেলেন আগামী দিনের প্রতুতির জন্য।

স্বাধীন কৃষক-রাজ

চারদিকে খবর ছড়িয়ে যায়, নতুন শাসনের বিধান নিয়ে এসেছেন শমসের গাজী। কৃষকরা এখন আর কোন জমিদারের অধীন নয়। তারাই জমি-জিরাত ফসল ভিটেমাটি আর দেশের আসল মালিক। তাদের একজন নেতা আছেন বটে। তিনিও কৃষকের ঘর থেকে এসেছেন। তার নাম শমসের গাজী। হিন্দু নেই মুসলিম নেই—দলে দলে কৃষক প্রজারা এসে এই নতুন ও স্বাধীন কৃষক রাজের সাথে সংহতি প্রকাশ করে যেতে লাগল। যুবকরা যোগ দিল তাঁর সেনাবাহিনীতে। গ্রাম উজাড় করে তরুণ দল সব ভীড় জমিয়েছে শমসের গাজীর শিবিরে।

শমসের তখনো বনের গভীরে। সেখানেই এসে যুবকরা তাঁর সাথে দেখা করে। তাঁর দলে যোগ দেয়। চলে গভীর প্রশিক্ষণ। অস্ত্র চালনার শিক্ষা দেয়া হয়। নিভৃত

বনে গড়ে ওঠে বিশাল কৃষক সেনাদল। এ সেনাদল প্রকাশ্যেই জমিদার নাসির মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

শমসের গাজী তাঁর দলবল নিয়ে একদিন জমিদার বাড়িতে প্রবেশ করেন। বাধা দিতে এগিয়ে আসেন জমিদার ও তার পুত্রগণ। গুরু হয় লড়াই। সে লড়াই-এ জমিদার আর পুত্ররা নিহত হন।

জমিদার-কন্যা স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেন বিজয়ী বীর শমসের গাজীকে। তিনিও একান্ত ঘোষণা করেন প্রজাদের সাথে।

এ খবর পৌঁছে ত্রিপুরার রাজার কাছে। শুনেই তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। বিড়বিড় করে বলেন এ অরাজকতা মেনে নেয়া যায় না। এভাবে প্রজারা জমিদারদের পরাস্ত ও খুন করলে শেষ পর্যন্ত আমাদের রাজত্ব নিয়েও টানাটানি শুরু করবে। শুরুতেই এ ধরনের বিদ্রোহ নির্মূল করে দিতে হবে।

তিনি তাঁর মন্ত্রীকে ডাকলেন। একদল সৈন্য নিয়ে এখনি শমসের গাজীর বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

সাথে সাথে যুদ্ধ-সাজ। ত্রিপুরার রাজকীয় বাহিনীর মোকাবেলায় শমসের গাজীর কৃষক সেনাদল।

জনগণ যেখানে জেগে উঠেছে, সেখানে রাজ-বিজয়ী হন কিভাবে?

রাজকীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মন্ত্রী শমসের গাজীর বীরত্ব মেনে নিয়ে বললেন শমসের গাজীকে শিক পরগনার জমিদার হিসেবে স্বীকার করে নিলাম। ত্রিপুরা রাজের অধীনে নতুন জমিদার।

শমসের গাজী হাসলেন। মনে মনে বললেন ত্রিপুরা রাজার অধীনে জমিদার হতে আমার বয়েই গেছে। রাজার পরাধীনতায় থেকে গরীব-দুঃখী চাষী প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা কোনদিন দূর করা যাবে না।

শমসের গাজী সময় ক্ষেপণ করলেন না। তিনি ত্রিপুরা রাজার সব ধরনের খাজনা দেওয়া বন্ধ করলেন। নিজেকে ঘোষণা করলেন রোশনাবাদ চাকলার স্বাধীন রাজা হিসেবে। কৃষকদের রাজা। পত পত করে উড়তে লাগল স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজার মুক্ত পতাকা। আর সেই পতাকা তলে চারদিক থেকে এসে সমবেত হতে লাগল সাধারণ জনগণ।

স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই শমসের কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার চাইতেও কঠিন কাজ স্বাধীনতা বজায় রাখা। একথা জানেন তিনি। এজনা তিনি এক লহমার জন্যে বিশ্রামে যাননি। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে শুরু করলেন। সেনাদল গড়ে তোলা অব্যাহত রাখলেন। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকলেন।

এ সময় ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সঙ্কট দেখা দেয়। ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্য মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর সিংহাসন নিয়ে পারিবারিক বিবাদ শুরু হয়।

সুযোগটা গ্রহণ করলেন শমসের গাজী। চলতে লাগল তাঁর সেনাদলকে উন্নত রূপে গড়ে তোলার কাজ। এজন্য সময়ও পেলেন।

যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য তখন ত্রিপুরা রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি মনোযোগ দেন শমসের গাজীকে দমন করতে। বারবার সেনাবাহিনী পাঠান। প্রতিবারই তাঁর বাহিনী পর্যুদস্ত ও পরাজিত হয়ে ফিরে আসে।

শমসের গাজী সিদ্ধান্ত নিলেন, এই অত্যাচারী ও ক্ষমতাদর্পী রাজ-পরিবারের রাজতন্ত্র খতম না করতে পারলে তাঁকে আর তাঁর কৃষক-রাজকে বারবার বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। তিনি তাঁর সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করেন।

এবারের যুদ্ধেও পরাজিত হন কৃষ্ণ মাণিক্য। তিনি নিজেকে ও তাঁর পরিবারকে শমসেরের কোপানল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাঁর সেনাদলের অবশিষ্ট সৈন্য ও রাজপরিবারের লোকজন নিয়ে রাজবাড়ির পেছনের ঝিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে উদয়পুর ত্যাগ করেন। আশ্রয় নেন আগরতলায়। সেখানেই নতুন করে গড়ে তোলেন তাঁর রাজত্বের নতুন রাজধানী। শমসের গাজী বীরের বেশে রাজধানী উদয়পুরে প্রবেশ করেন। স্বাধীন কৃষক-রাজের পতাকা উদয়পুরের আকাশে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

কুকিদের নিয়ে নতুন চাল

যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের এক ধ্যান এক জ্ঞান। যেকোন মূল্যে শায়েস্তা করতে হবে শমসের গাজীকে। ফিরিয়ে আনতে হবে তাঁর পিতৃদেবের হারানো রাজত্ব। সাধারণ প্রজারা যদি নিজেদের সরকার কায়েম করে তাহলে রাজা উজির জমিদাররা যাবে কোথায়? কোথা' থেকেই বা আসবে তাদের বিলাস-ব্যাসন আমোদ-ফুর্তির টাকা-কড়ি?

আগরতলায় সুরক্ষিত আশ্রয়ে থেকে ভাবেন যুবরাজ। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করার জন্য ফন্দি-ফিকির খোঁজেন।

শেষ পর্যন্ত একটা হাতিয়ার পেয়ে যান তিনি। এই হাতিয়ার প্রয়োগেই ত্রিপুরা ও আগরতলার প্রজাদের ধন-বল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পাহাড়ী কুকিরা হল তাঁর সেই হাতিয়ার। তিনি তার লোকজনদের দিয়ে পাহাড়ী কুকিদের নানান কায়দায় উস্কানোর চেষ্টা করলেন। শমসের গাজী লোক ভাল নয়। তিনি যদি এমন করে রাজত্ব করেন, তাহলে বনের পর বন পাহাড়ের পর পাহাড় ধ্বংস হয়ে যাবে। কুকিদের উপরেও হামলা আসবে। তাদের ধন-বল সব লুণ্ঠ করে নিয়ে হয় তাদেরকে গোলাম বানানো হবে, না হয় তাদেরকে বন-পাহাড়ের আদিবাস থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্ম নিয়েও টানাটানি হবে।

কুকিরা যুবরাজ আর তাদের লোকদের প্রচার-প্রোপাগান্ডা, কথা-বার্তা কিছুই বিশ্বাস করে না। কানেই তুলতে চায় না। বলে তোরা যখন রাজা ছিলি তখনি আমাদের কষ্ট ছিল। তোদের লোকেরা কত যে মারধর করত। পিঠে এখনো ঘা দগদগে হয়ে আছে। কিন্তু এ রাজা আমাদের ছুঁয়েই দেখিনি। ওরা তো কেবল মুসলমান নয়, ওদের দলে তো হিন্দুও আছে। কই, কারো তো ধর্ম নষ্ট হয়নি?

অবশেষে কৃষ্ণ মাণিক্য কুকিদের ব্যাপারে অন্য পথ ধরল। শমসের গাজীর নাম ভাঙিয়ে তার লোকরাই কুকিদের উপর নির্যাতন চালাতে লাগল। এদিকে কুকিদের মাথা যারা তাদের মধ্যে ঢাকা ছিটাতে লাগল।

এতসব ঘটনার পর কুকিরা চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা কৃষ্ণ মাণিক্যের ইচ্ছা অনুসারে শমসের গাজীর কৃষক বাহিনীর উপর বারবার হামলা চালাতে লাগল। কিন্তু কৃষক বাহিনীর প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণের মুখে পড়ে তারা দ্রুত পালিয়ে যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করে।

শমসের গাজী বললেন এতো দেখছি ভাল ফ্যাকরা। যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য কুকিদের নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ভালই চাল খেলেছে।

শমসের গাজীর একজন পারিষদ পরামর্শ দিলেন ঐ তো কয়েক ঘর কুকি। পাহাড়েই থাকুক আর সমতলে এসে আমাদেরকে উৎপাতই করুক, ওদেরকে তো এক নিমেষে নির্মূল করে দেয়া যায়। তেমন অভিযানই চলুক না কেন?

শমসের গাজী বিরক্ত হয়ে বললেন ওরা রাজা, না জমিদার? —ওদের সাথে তো আমাদের কোন শত্রুতা নেই। আমাদের দুশমন ওদেরও দুশমন। চালাক যুবরাজ আমাদের নিজেদের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের শক্তি ক্ষয় করতে চাইছে। ওদের এই দুষ্ট পরিকল্পনাটাই ভঙুল করে দিতে হবে।

শমসের গাজীর মন্ত্রী রামধন বিশ্বাস। তার নেতৃত্বে শমসের গাজীর লোকরা শান্তি ও শুভেচ্ছার বার্তা নিয়ে গেল কুকিদের পাহাড়ি বসতিতে।

তারা বোঝাল, শমসের গাজী আমাদের রাজা নন, নেতা। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন শাসক হলেন শমসের গাজী। তাঁর শাসনে সব গরীব প্রজার মধ্যে, এমনকি ক্রীতদাসদের মধ্যেও বিনা মূল্যে জমি বন্টন করে দেয়া হয়েছে। এ জমি কুকিরাও পাবে। যারা গরীব মানুষ, তাদেরকে এক পয়সাও খাজনা দিতে হবে না। এদেশে মুসলমানও আছে। হিন্দুরাও আছে। কুকিরাও আছে। সবাই ভাই ভাই। মুসলমানদের যে সুবিধা, অন্য ধর্মের লোকদেরও সেই সুবিধা—কোন তফাত নাই।

শুনে শুনে কুকিরা মুগ্ধ। তারা শমসের গাজীর পতাকা তলে এসে যোগ দিল।

গাজী, না ডাকাত?

শমসের গাজীকে ডাকাত বলে ডাকে ইংরেজ আর জমিদারের লোকরা। ডাকবেই তো। তারা গরীব প্রজাদের লুণ্ঠ করে নির্যাতন অত্যাচার করে যে টাকা আদায় করে নেয়। তাই আবার ছিনিয়ে নেয় শমসের গাজী। শমসের গাজীর নির্দেশে গ্রামে গ্রামে অনেকগুলো পুকুর খনন করা হয়। এছাড়াও রয়েছে নানা জনহিতকর কাজ। এদিকে গরীব প্রজার সংখ্যাই বেশি। তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার প্রশ্নই ওঠে না।

এখন প্রজা মঙ্গলের কাজ করতে হলে প্রচুর টাকা দরকার। অবস্থাপন্ন বড়লোকদের কাছে স্বৈচ্ছামূলক সহযোগিতা চাইলেন শমসের। তাঁর ডাকে তেমন একটা সাড়া পাওয়া গেল না। গরীবের ভাণ্ডার আত্মসাৎ করে যে তহবিল গড়ে উঠেছে, তাঁ আবার গরীবের কল্যাণেই ফিরে যায় কিভাবে? এমনও জমিদার রয়েছে যে জীবনে একটি পয়সাও দান-খয়রাত করেনি।

শমসের গাজী জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভিন্ন এক পথ বেছে নিলেন। তিনি ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের ইংরেজদের দখলাধীন বিভিন্ন পরগনার জমিদারদের বাড়িতে লুণ্ঠন অভিযান চালাতে লাগলেন। এভাবে ইংরেজ ও পার্শ্ববর্তী জমিদারদের মধ্যে শমসের গাজীর খ্যাতি ও আতংক ছড়াতে লাগল ডাকাত হিসেবে। দেশের অরাজকতার সুযোগ নিয়ে চোরাকারবারিরা সুবিধা লুটতে শুরু করল। তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিল।

শমসের গাজী স্বাধীনতা ঘোষণা করেই চোরাকারবারিদের দমন করলেন কঠোরভাবে। তিনি জিনিসপত্রের কেনা-বেচার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করলেন। তাঁর হুকুমে ৮২ সিক্কা ওজনের সের ধার্য হল। তিনি বাজারের সামনে প্রতিটি জিনিসের বাজার দর নির্ধারণ করে তার ফরমান ঝুলিয়ে দিলেন। এর অন্যথা করার উপায় নেই।

তাপের মুখে বীরত্ব গাথা

মীর কাসিম তখন বাংলার নবাব। ইংরেজদের আর্শীবাদপুষ্ট হয়েই তিনি নবাব। তাঁর কাছেই ধর্ণা দিলেন যুবরাজ কৃষ্ণ মাণিক্য। ইংরেজরাও নবাবকে সতর্ক করে দিয়েছে। ঐ বিদ্রোহী স্বঘোষিত শাসককে শাস্যস্তা করতে না পারলে নবাবের কপালে ভোগান্তি রয়েছে।

কৃষ্ণ মাণিক্যের মুখে শমসের গাজীর গল্প শুনে চমৎকৃত হলেন মীর কাসিম। বাহ! এই তো একজন সাহসী বাংলার কৃষককুলে জন্ম নিয়েছেন! তাঁকে সালাম।

কিন্তু কৃষ্ণ মাণিক্যের অনুরোধে ও ইংরেজদের চাপে মীর কাসিম কৃষ্ণ মাণিক্যকেই ত্রিপুরার রাজা হিসেবে মেনে নিলেন। ইংরেজদের সাহায্যপুষ্ট এক বিশাল সৈন্যবাহিনী শমসের গাজীকে দমন করতে ত্রিপুরার উদ্দেশে যাত্রা করে।

সুশিক্ষিত ও বন্দুক-কামানে সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি শমসের গাজীর কৃষ্ণ-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শমসের গাজী বন্দী হন নবাবের বাহিনীর হাতে। তাঁকে মুর্শিদাবাদের কারাগারে কিছুদিন বন্দী করে রাখা হয়।

১৭৬৮ সালের শেষ ভাগ। নবাব হুকুম দিলেন বিদ্রোহী স্বাধীন কৃষ্ণক-রাজাকে তোপের মুখে বেঁধে হত্যা করতে হবে।

গুনে হাসলেন বীর শমসের। বললেন পরাধীন নবাবের কাছে, বিদেশী বেনিয়া ইংরেজের পুতুলের কাছে একজন স্বাধীন মানুষ এর বেশি আর কি প্রত্যাশা করতে পারে? তবে নবাবের হৃদয়ে যদি এদেশের প্রতি, এর জনগণের প্রতি এতটুকু ভালবাসা থাকে, থাকে যদি বীরত্ব ও পুরুষত্ব, তাহলে তাঁকেও আমার মত রক্তে দাঁড়াতে হবে। বিশ্বাসঘাতকের মড়কস্ত্রে তাঁকেও আমার মত মৃত্যুবরণ করতে হবে।

চতুর্থ পর্ব

র বা ট লি ভ সে র গ ল্প



হয় শহীদ নয় গাজী

মুহররম। ১৭৮২।

উপনিবেশ ভারতবর্ষের চারদিকে আগুন জ্বলছে। বিদ্রোহের আগুন। ভারতবর্ষের মাটিতে ব্রিটিশ বেনিয়ার শাসন মানবে না। দিকে দিকে গণবিদ্রোহ।

সিলেট। গত বছর প্রবল বন্যার তোড়ে ক্ষেত-ফসল সব ভেসে গেছে। অভাবী মানুষের পেটে ক্ষুধা। মনে আগুন। হৃদয়ে বিপ্লব।

সিলেটের ইংরেজ কালেক্টর রবার্ট লিভসে। পাঁচ পাউন্ডের রাইটারের চাকরি নিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। দারুচিনি গরম মশলার দেশ ভারত। সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জনপদ বাংলা। বিদেশীদের জন্য ভাগ্য ফেরানোর সহজ উপায় রয়েছে এই দেশে। রবার্ট লিভসে লর্ড ক্লাইভের মতই ধনবান হয়ে বিলেত ফিরতে এসেছেন এই দেশে। প্রথমে কলকাতা। সেখান থেকে ঢাকা। তারপর তয়-তদ্বির করে হয়েছে সিলেটের কালেক্টর। সিনিয়র অনেককে ডিস্মিয়ে।

লিভসে তাঁর আরাম ঘরে বসে ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসেব কষছিলেন। কড়ির ব্যবসা, চূনাপাথরের ব্যবসা। হাতি আর হাতির দাঁতের ব্যবসা। মধুর ব্যবসা। জাহাজের কারবার।

আরাম হারাম হয়ে গেল। খবর এল : বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। মুহররমের মাতম নিয়ে জেগে উঠেছে ক্ষুধার্ত মানুষ। শহরের চারদিকে আগুন। ইংরেজ শাসন মানতে চায় না জনগণ।

লিভসে ভাবলেন, ভাগ্য বুঝি ভেঙ্গে যায়। মুহররম মাস। তেজি মুসলমানদের জেগে ওঠার সময়।

লিভসে উঠে দাঁড়ালেন। কড়াভাবে দমন করতে হবে এ বিদ্রোহ। ছলবেলে কৌশলে। পিস্তলে কার্তুজ ভরলেন। তিনি মুকাবিলা করবেন বিদ্রোহের। কিন্তু ভাবটা থাকবে তিনি নিরস্ত্র। পিস্তলটা দিলেন তাঁর ভৃত্যকে। বললেন, যখনই চাইবেন তখনই যেন ভৃত্য তাঁকে পিস্তল এগিয়ে দেয়। নিজের কাছে রাখবেন একটা তলোয়ার। তাঁর বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

হাদা মিয়া। মাধা মিয়া। পীরজাদা দুই ভাই। তাঁদের সাথে শ' তিনেক মুজাহিদ। ঈদগাহের কাছে পাহাড় উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছেন। বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত।

লিভসে তাঁর দলবল নিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁদের মুখোমুখি।

লিভসে তাঁর তলোয়ার উঁচিয়ে বললেন শহরে তোমরা দাঙ্গা শুরু করেছ কেন?

পীরজাদাদের একজন বললেন সাহেব, দাঙ্গা তো আমরা শুরু করিনি, শুরু করেছ তোমরা। পলাশীর প্রান্তর থেকে।

চতুর লিভসে ঘটনার অপব্যাখ্যা করলেন। বললেন : মুহররম মাসে তোমরা ধর্মকর্ম করছ ভাল কথা। কিন্তু হিন্দুদের সাথে দাঙ্গা করছ কেন? মন্দির ধ্বংস করছ কেন?

পীরজাদাদের একজন জবাব দিলেন ভুল বললে সাহেব, আমরা হিন্দুদের সাথে দাঙ্গা করছি না। তাদের মন্দিরও ধ্বংস করছি না। এদেশ আমাদের। তোমাদের নয়। আমরা তোমাদের উৎখাত করব।

লিভসে গুঁদের কথায় ক্রক্ষেপ না করে কঠোর কণ্ঠে বললেন এই এলাকার হেড ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমি তোমাদের কাছে এসেছি। আমি শুনেছি খানিক আগে দাঙ্গা হয়েছে। আগামী দিন আমি এর তদন্ত করব। এখন আমার উদ্দেশ্য হল, তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করে শান্তভাবে ফিরে যাও।

শত শত মুজাহিদ গর্জে উঠল না।

পীরজাদাদের একজন তাঁর কোষ থেকে তলোয়ার বের করে উঁচিয়ে ধরলেন। বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন এখনই সময় হত্যার, নয় মৃত্যুর। হয় শহীদ নয় গাজী। খতম হয়ে এলো ইংরেজ-রাজ।

তিনি তাঁর তলোয়ার নামিয়ে আনলেন লিভসের উপর। কিন্তু ফসকে গেল আঘাত। পড়ল লিভসের তলোয়ারের উপর। লিভসের তলোয়ার ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। হাতলটি রয়ে গেল তাঁর হাতে। ভৃত্য দ্রুত এগিয়ে দিল পিস্তল। লিভসে কাল-বিলম্ব না করে গুলি করলেন। পীরজাদা পড়ে গেলেন। তাঁর কাপড়ে পিস্তলের গুলির আঙুন।

পীরজাদার চোখ তখনো খোলা। জ্বলছে।

ইংরেজ সেনাদল হামলে পড়ল মুজাহিদদের উপর। বেয়নেট চার্জ করে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল বিপ্লবীদের। কিন্তু আতঁনাদ নয়, মুজাহিদদের কণ্ঠে তখনো বিপ্লবী উচ্চারণ খতম হোক ইংরেজ-রাজ।

যে আগুন ছড়িয়ে যায়

রণক্লান্ত লিভসে তাঁর আরাম ঘরে। তখন রাত নেমেছে। এ সময় কয়েকজন ইউরোপীয় দৌড়ে এল তাঁর বাসায়। তারা আশ্রয় চায়। জানাল, বাইরে লোক জমায়েত হচ্ছে। তারা লিভসের বাড়ি আগুনে জ্বলিয়ে দেবে। একটা একটা করে খুন করবে ইউরোপীয়দের।

লিভসে জানালার পর্দা সরালেন। দেখলেন, তাঁর বাসভবন ঘেঁষে একদল লোক এগিয়ে যাচ্ছে। গুঁদের হাতে মশাল।

লিভসে সেনাবাহিনী পাঠালেন। গুঁদের বাধা দিতে।

সেনাবাহিনী এসে থামাল মিছিলটিকে। জিজ্ঞেস করল, মশাল শোভাযাত্রা কেন?

ওরা জানায়, শহীদদের দাফন করতে ওরা নিয়ে যাচ্ছে গোরস্থানে।

ওদেরকে জানান হলো, বিদ্রোহীদের এমন সম্মান দেখিয়ে দাফন করা যাবে না।

থমকে দাঁড়াল শোক-মিছিল। একজন তরুণ চিৎকার করে উঠল : আগুন! আগুন! মনে হচ্ছে সব জ্বালিয়ে দিই।

একজন প্রবীণ তরুণের কাঁধে হাত রাখল। শান্ত কণ্ঠে বলল এখন নয়। এই আগুন জ্বালিয়ে রাখ নিজের হৃদয়ের নিভুতে। সময় হলে ছড়িয়ে দিও সব দিকে।

পরদিন লিভসের অনুমতি নিয়ে নীরবে শহীদদের দাফন করা হল। শহীদদের অনুভূতি নিয়ে নিভুতে আগুন জ্বলে উঠল সবক'টি তাজা প্রাণে।

আল্লাহর দূত

সিলেট বেড়াতে এসেছেন রবার্ট হ্যামিলটন। লিভসের বন্ধু। নৈশভোজে বসেছেন তাঁরা। লিভসে বসে আছেন দরজার দিকে মুখ করে। হ্যামিলটন বসেছিলেন টেবিলের উল্টোদিকে, দরজার দিকে ফিরে।

এ সময় ভৃত্য এসে খবর দিল, একজন ফকির লিভসের সাথে দেখা করতে চান।

লিভসে তাঁকে ভেতরে আনতে বললেন।

ফকির ঘরে ঢুকলেন। হ্যামিলটনের পেছনে দাঁড়ালেন। বললেন সিলেটে ঢোকার পর আমার সব কিছু লুণ্ঠ হয়ে গেছে। এর প্রতিকারের আশায় আমি আপনার কাছে এসেছি।

ফকির হড়বড় করে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন। তাঁর ভেতরে অস্থিরতা। চোখদু'টো জ্বলছে বিজাতীয় বিদ্বেষে। তাঁর ডান হাত ছিল কোমরবন্ধের উপর। যে কোন ঘটনা ঘটিয়ে দেয়ার জন্য যেন তিনি প্রস্তুত।

লিভসে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন ফকিরের দিকে। ফকিরের কিছু একটা মতলব যেন রয়েছে এ ধরনের ধারণা তাঁর মনে খেলে গেল। কিন্তু তাঁর চেহারা বা মুখভঙ্গি থেকে তা বোঝা গেল না। তিনি যেন ফকিরের সাথে কথা বলছেন, এমন ভাব নিয়ে বললেন : হ্যামিলটন, ধাক্কা দিয়ে ব্যাটাকে ফেলে দাও।

হ্যামিলটন হকচকিয়ে গেলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে লিভসে কি বলছেন তা যেন তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। ইতস্ততঃ করছেন।

লিভসে ধমকের সুরে আবার বললেন : যা বলছি তা কর।

হ্যামিলটন ত্বরিত উঠে দাঁড়ালেন। ফকিরকে লক্ষ্য করে ঘুষি চালালেন। ফকির মাটিতে পড়ে যাচ্ছেন। পড়তে পড়তে তিনি কোমরবন্ধ থেকে বের করে আনলেন লুকোনো ছোরা। হ্যামিলটনকে লক্ষ্য করে হাত চালালেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পড়ে

গেলেন মেঝের উপর। হাহাকার করে উঠল তাঁর হৃদয়। ব্যর্থতার হাহাকার। নিজের বুকেই চালালেন ছোরা। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। জ্ঞান হারালেন ফকির।

জ্ঞান ফিরলে লিভসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি এমন করলে কেন?

ফকির স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন লিভসের দিকে। ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন : আমি আল্লাহর দূত। আমি এসেছি কাকের জুলুমবাজ ইংরেজ বেনিয়াদের খতম করতে।

লিভসের উপরই স্থির হয়ে গেল ফকিরের দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে বিদেশী শাসকদের প্রতি আমৃত্যু ঘৃণা।

বিশ বছরের ঘৃণা

১৭৮২। মুহররমের ঘটনার দিন থেকে বিশ বছর পর।

পাঁচ পাউন্ডের রাইটার রবার্ট লিভসে এখন ধনকুবের। বিশাল ধনসম্পদের মালিক। বিলেতের অভিজাত পাড়ায় তিনি অবসর জীবনযাপন করছেন।

লিভসে একদিন রুটিন-মাসিক ঘোড়ায় চেপে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। এ সময় তাঁর পথের উপর এক যুবককে দেখতে পেলেন। পোশাক-আশাক-আচরণে প্রাচ্যদেশীয় মনে হয়। পাড়ার পাদ্রী মিস্টার স্বলের বাসভবনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন যুবক।

যুবককে দেখে বিস্মিত হলেন লিভসে। হিন্দুস্থানী ভাষায় তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি জন্মেছ কোথায়?

যুবক ইতস্ততঃ করে জবাব দিলেন কোলকাতায়।

লিভসে ধমক দিয়ে বললেন মিথ্যে বলছ। তোমার বলার ঢং উচ্চারণ তা বলে না। তোমার জন্ম নিশ্চয়ই অন্য কোথাও।

যুবক বললেন : আপনি ঠিকই বলেছেন। বিদেশে আমাকে কেউ এমনভাবে জেরা করবে, আমি ধারণা করিনি। সাহেব, আপনি কে? কোথায় আপনি থাকেন?

লিভসে তাঁর নাম জানালেন। পাহাড়ের উপর নিজের বাড়ি দেখালেন। সেখানে পরদিন সকালে তাঁর সাথে দেখা করতে বললেন যুবককে।

পরদিন সকাল বেলা। লিভসের বাসভবনে সময়মত উপস্থিত হলেন যুবক। লিভসে তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

লিভসে জিজ্ঞেস করলেন তোমার নাম কি?

যুবক বললেন সৈয়দউল্লাহ।

প্রথম সাক্ষাতে তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছিলে কেন?

আমাদের ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে আপনি আমায় অবাক করে দিয়েছিলেন।

সত্যি কথা হলো, আমার জন্য বাংলাদেশের সিলেটে। এখানে এসেছি মিস্টার শ্বলের ছেলের ভৃত্য হয়ে। আপনার নামের একজন আমাদের দেশে খুব বিখ্যাত হয়ে আছেন। লন্ডনে আমি তাকে অনেক খুঁজেছি। কিন্তু এখনো তার কোন খোঁজ পাইনি।

লিভসে বললেন : মনে কর, আমিই সেই।

চমকে উঠলেন সৈয়দউল্লাহ। প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে তাকালেন লিভসের দিকে। বললেন : কি? আপনিই খুন করেছিলেন পীরজাদাকে?

লিভসে বললেন : হ্যাঁ, কারণ তিনি তলোয়ার হাতে আক্রমণ করেছিলেন আমাকে। তাঁর কৃতকর্মের ফল তিনি ভোগ করেছেন।

লিভসে জিজ্ঞেস করলেন : সংঘর্ষের সময় তুমি কোথায় ছিলে সৈয়দউল্লাহ?

সৈয়দউল্লাহ বললেন : আমি তখন বালক। জেহাদের সময় আমি ছিলাম পাহাড়ের উপর, ঘরবাড়ির কাছে।

সৈয়দউল্লাহর কণ্ঠস্বর রুঢ় হয়ে উঠল : আপনি আমার পিতাকেও হত্যা করেছেন।

লিভসে জিজ্ঞেস করলেন : তিনি কি একজন বৃদ্ধ?

হ্যাঁ।

তোমার পিতা মারা গেছেন যুদ্ধে। আমার পায়ের কাছে জখম হয়ে পড়েছিলেন তিনি। একজন সিপাহী বেয়নেট দিয়ে তাঁকে গাঁথে ফেলছিল প্রায়। সে মুহূর্তে পা দিয়ে আমি তাঁকে সরিয়ে দিই। আমিই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। ঠিক কিনা?

সৈয়দউল্লাহর চোখদুটি অর্ধ হয়ে এল। তিনি স্বগোষ্ঠির মত বললেন : ঠিক। তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। এর ফলেই মাস কয়েক পর তিনি মারা যান।

সৈয়দউল্লাহ কিছুক্ষণ লিভসে-পরিবারের সাথে সময় কাটান। কথায় কথায় তিনি জানান, তিনি রান্নাবান্নার জন্য খ্যাত। তাঁকে পরদিন এসে মুরগী রেঁধে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হল।

পরদিন সকাল। নাস্তার টেবিল। গভর্নেস ইতস্ততঃ করে বলল : একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানাবার আছে। আমি জানি, স্বপ্ন বিশ্বাস করতে নেই। কিন্তু—

বাক্য শেষ করতে পারল না গভর্নেস। কান্না এসে গেল তার কণ্ঠস্বরে। ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল : আমি গতরাতে এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি। এ স্বপ্ন না বলে থাকা যায় না। স্বপ্নে দেখি, পূর্ব থেকে এক কালো লোক এসে মিস্টার লিভসে আর তাঁর পরিবারকে বিষ খাইয়েছে। আমার করজোড়ে নিবেদন, আজ যা রান্না হবে তা যেন টেবিলে দেয়া না হয়।

সৈয়দউল্লাহ নির্ধারিত সময়ে এসে রান্না শুরু করলেন।

নৈশভোজের আগে বৃদ্ধ হাউসকীপার পাশের রুমে মিসেস লিভসেকে ডেকে নিয়ে উত্তেজিত স্বরে বলল : ম্যাডাম, এই সামান্য বিষয় আপনাকে জানানো ঠিক কিনা জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় ঘটনাটি আপনাকে জানানো দরকার। সে যখন রান্না করছে

তখন আমি দেখেছি। রান্নার সময় সে একবারও তরকারিটা চেখে দেখেনি। আমি বললাম, লবণ বোধহয় ঠিক হয়নি। সে বলল, না না, সব ঠিক আছে। ম্যাডাম সাহেবকে বলুন, তিনি যেন এ তরকারি না খান।

পরিবারের সবাই লিভসেকে এই অনুরোধ জানাল। লিভসে কান দিলেন না। সৈয়দউল্লাহর রান্না খেলেন। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বললেন এত চমৎকার রান্না আগে দেখিনি। এত চমৎকার নৈশভোজও এর আগে আর কখনো করিনি।

রান্না নিয়ে সন্দেহের কথা বলা হলে সৈয়দউল্লাহ বললেন মুরগিটা মেরেছিল আপনার রাধুনে। যদি সে হালাল মত মুরগি জবাই করত, তাহলে রান্না চেখে দেখার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি থাকত না।

সৈয়দউল্লাহ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন একজন খাঁটি মুসলমান খাবারে বিষ মিশিয়ে শত্রুকে মারে না। সে লড়াই করে মুখোমুখি। যে বিষ আমার হৃদয়ে আমি বহন করছি বিশটি বছর ধরে, তা নিয়ে আমি দাঁড়াব সামনাসামনি।

সৈয়দউল্লাহর দু'চোখে ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠল।

গম চাষের স্বপ্নভঙ্গ

লিভসে সাহেবের নানান ধান্দা। রুটি-রুজির খোঁজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটার হিসেবে এসেছিলেন কলকাতা। সেখান থেকে ঢাকা। এরপর তর-তর করে সিলেটের কালেক্টর। কোম্পানির কাজের পাশাপাশি নিজের ধান্দাও চলে। কড়ির ব্যবসা। চুন ও চুনাপাথরের ব্যবসা। জাহাজ নির্মাণ ব্যবসা। হাতির ব্যবসা।

তিনি দেখলেন, সিলেটের জমি উর্বর। লোকবলও যথেষ্ট। ইচ্ছা করলে পুরো এলাকাটাকেই বাগানে বদলে দেয়া যায়। এখানকার মাটি গম চাষের জন্য উপযোগী। কিন্তু কারুরই এদিকে নজর নেই। কেউ এক দানা গমও ফলায় না বার্ষিক বৈঠকে এলাকার জমিদাররা এসেছে। গম চাষে এদেরকেই উদ্বুদ্ধ করা যায় কিনা, ভাবলেন রবার্ট লিভসে। জমিদারদের সম্বোধন করে তিনি বললেন : আপনাদের এখানকার জমি খুব উর্বর। গম চাষ করার জন্য খুব ভাল। কিন্তু আপনারা গম চাষ করেন না কেন?

জমিদাররা এ ওর মুখের দিকে তাকায় সবিস্ময়ে। লিভসে বলেন আপনাদের জমিতে যদি গম লাগান, তাহলে দেখবেন আপনাদের জমির দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে।

জমিদারদের একজন বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলল গম চাষে সাধ থাকলেও আমাদের উপায় নেই। গমের বীজ পাব কোথায়?

কিন্তু জমিদার জানে না, কোম্পানির কর্তা তাদের চাইতেও সেয়ানা। লিভসে বললেন: বীজ যদি পান, আপনারা কি গম চাষ করবেন?

জমিদাররা বলল অসুবিধা কি? গম চাষ করলে জমির দাম যদি দ্বিগুণ হয়, তাহলে তো আপত্তির কোন কারণ নেই।

লিভসে সাহেব বিলেত থেকে পঞ্চাশ মন গমের বীজ ইতোমধ্যেই আমদানি করে রেখেছেন। তিনি এ বীজ জমিদারদের মধ্যে সমান পরিমাণে ভাগ করে দিলেন।

গমের বীজ নিয়ে জমিদাররা প্রজাদের সাথে বৈঠকে বসল। গমের বীজ নিয়ে কি করা যায়, এটাই হলো তাদের আলোচ্য বিষয়।

আমরা ভাতের লোক। ক্ষেতে ধান বুনি। তাই খেয়ে পেট ভরাই। গম তো আমাদের খাদ্য নয়।

গম ফলালে জমির দাম দ্বিগুণ হবে।

জমি কি বেচার জন্যে, না ফলনের জন্যে? আর ঐ ব্যাটা সাহেব, গমের ন্যায্য দাম দেবে তার ভরসা কি? ওরা জুলুমবাজি ছাড়া কোন কিছুর কি হক আদায় করেছে?

ব্যাটা সাহেব মতলব আঁটছে না তো ধানের ফলন বন্ধ করে আমাদের ভাত খাওয়া বন্ধ করতে? তার বদলে গমের আটা চালু করতে?

তাহলে তো সাহেবেরই গমের ব্যবসা রমরমা।

এরপর আসবে ভূট্টা লাগাও, নীল লাগাও।

: আমাদের জমিতে আমরা কি চাষ করব। তা আমাদের এজিয়ার, আমাদের এই অধিকারে লিভসে সাহেব নাক গলাবে কেন?

সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হল। তারা কেউ গম আবাদ করবে না। এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে হবে।

লিভসে সাহেব গমের স্বপ্ন বোনের। জমিদারদের সাথে দেখা হয়। মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করেন ফলন কেমন?

ওরা মাথা নেড়ে জবাব দেয় ভালই।

লিভসে আশ্বাস দেন চিন্তা করবেন না। উপযুক্ত মূল্যে সব গম আমি কিনে নেব।

জমিদাররা মনে মনে বলে : সাহেব, তোমার উপযুক্ত মূল্য আমাদের জানা আছে। এই মূল্য পেয়ে পেয়েই তো আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়েছি।

ফসল কাটার সময় আসে। লিভসে সাহেব গমের অপেক্ষায় থাকেন। গম আসে না।

লিভসে সাহেব গমের ফলন দেখতে বেরোন। সিলেটের সমগ্র প্রকৃতি তার দিকে দাঁত মেলে হাসে। প্রান্তর জুড়ে ধানের হাতছানি। তার ভীড়ে গমের কোন স্থান নেই।

রবার্ট লিভসের খুব রাগ হয়। ওরা তাকে ফাঁকি দিয়েছে। রাগ হলেও বলার নেই কিছু। এখনি এদেরকে চটাতে চান না তিনি। মাঝখান থেকে তার পঞ্চাশ মণ গমের বীজ পানিতেই ভেসে গেল।

লিভসে সাহেবের দুর্গ

পাণ্ডুয়া । সিলেট । ঠিক পাহাড়ের নিচেই এক খোলা চারণভূমি । আল্লাহ তাঁর সৌন্দর্যের নেয়ামত যেন রেখে দিয়েছেন এখানে । পাহাড় । জলপ্রপাত । নদী । সবুজ প্রান্তর । দেখেই সিলেটে কোম্পানির কালেক্টর রবার্ট লিভসের লোভাতুর মন নেচে ওঠে । পাহাড় থেকে চুন ও চুনাপাথর সংগ্রহ করে নিজের ব্যবসা গড়ে তুলেছেন । এ ব্যবসা নিরাপদ করতে এমন একটা জায়গাই খুঁজছিলেন তিনি । এখানেই গড়ে তুললেন এক দুর্গ । পাহাড়ী খাসিয়াদের সাথে দোস্তির ভান করে হাত বাড়িয়ে দিলেন । কিন্তু তার দুর্গের আশেপাশে ঘেঁষতে নিষেধ করলেন তাদের । এভাবে বন্ধুত্বের ভান করে লিভসে লোভের থাবা ছড়িয়ে দিলেন খাসিয়া এলাকায় ।

খাসিয়াদেরকে বন্ধু বলে ডাকলেও তাদের প্রতি বিশ্বাস নেই এক বিন্দুও । তাদের এলাকা থেকে চুন ও চুনাপাথর সংগ্রহ করেন । তাদেরকে দিয়েই খাটিয়ে, বোঝা বইয়ে সমতলে নিয়ে আসেন । নৌকায় তুলে ঢাকায়, কলকাতায় বা দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেন । কিন্তু কোন খাসিয়াকেই ঘেঁষতে দেন না তার দুর্গের আশেপাশে ।

এদিকে দুর্গটাকে বানিয়েছেন শক্ত করে । সেখানে তাঁর হাবিলদার রয়েছে । রয়েছে জোয়ান-তাগড়া পাহারাদার বাহিনী ।

দূর-পাহাড়ের এক খাসিয়া রাজা এসেছেন পাণ্ডুয়ায় । পাহাড়ে তাঁর অবাধ বিচরণ । কিন্তু সমতল ভূমি যে ব্রিটিশ কোম্পানির হানাদাররা দখল করেছে, সেটা তাঁর জানারকথা নয় ।

পাহাড়ের নিচে প্রান্তর দেখে তাঁর ভাল লাগল । প্রান্তরে একটা দুর্গ রয়েছে, সেটা তিনি গ্রাহ্যে আনলেন না । দুর্গ ও দুর্গবাসীরা থাকবে তাদের মত । তিনি থাকবেন তাঁর মত— কারো স্বাধীনতার অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না সেটাই তো কাম্য ।

দুর্গের কাছে-ধারেই খাসিয়া রাজা আস্তানা গড়লেন । তিনি তো আর জানেন না যে সমতলের আসল মানুষরা তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছে ।

লিভসে সাহেবের গোলামরা দুর্গের ভেতর থেকে ঘটনা দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল । হাবিলদার তার লোকজন নিয়ে এগিয়ে এল । কড়া ভাষায় হুকুম দিল, এখান থেকে আস্তানা গুটাতে হবে আর এই মাল-সামান ফেলতে হবে নদীতে ।

খাসিয়া রাজা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন কেন?

হাবিলদার বলল এটা লিভসে সাহেবের এলাকা ।

খাসিয়া রাজা জিজ্ঞেস করলেন লিভসে সাহেবটা কে?

ইংরেজ সাহেব । এলাকার রাজা ।

আমিও রাজা । খাসিয়া রাজা । ঐ পাহাড় খাসিয়াদের । এ এলাকা ঐ পাহাড়েরই অংশ । সুতরাং এ এলাকাও খাসিয়াদের ।

: আগে ছিল, এখন নাই। এখন ইংরেজদের রাজত্ব।

: তাই নাকি? জানি না তো!

এখন জানতো। তোমার এসব নোংরা আপত্তিকর জিনিসপত্র ঐ নদীতে ফেল। আর এখনি এখন থেকে ভাগ।

আমি এ এলাকায় প্রথম এসেছি। এটাকে আমাদের এলাকা বলেই জানতাম। আমাদের এলাকা যে পরের দখলে গিয়েছে তা তো বুঝি নাই। বেশ, ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সাবধান থাকব।

তোমাকে এখনি সরে যেতে হবে।

খাসিয়া রাজা মাথা নাড়লেন। গম্ভীর হয়ে বললেন তা তো হবার নয়। আমি যখন এখানে এসে আস্তানা গেড়েছি, তখন আমার মর্জি মত এখানেই থাকব। তোমাদের হুকুমে এখন থেকে এখন সরে গেলে আমার অধর্ম হবে। আর খাসিয়া রাজার উপর তোমাদের হুকুম চলবে না। তোমরাই সরে যাও। আমার মত করে আমাকে শাস্তিতে থাকতে দাও।

আধ-ন্যাংটা খাসিয়া রাজা। বর্বরের এক শেষ। সে মানবে না ইংরেজ কোম্পানির হুকুম ভাবতেই হাবিলদারের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে তার লোকদের হুকুম করল। অমনি লিভসের ভাড়াটে গোলামরা হামলে পড়ল খাসিয়া রাজার উপর। তাদের হাতে লাঠিসোটা। খাসিয়া রাজাও কম নয়। তিনিও মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কিন্তু একা এতগুলো লোকের সাথে পারবেন কেন? লাঠির ঘায়ে ঘায়ে সারা শরীর তাঁর জখম হল। চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে দেহ রক্তাক্ত করে তুলল। তার জিনিসপত্র সব ছত্রখান করা হল। ভাসিয়ে দেয়া হল নদীর পানিতে। খাসিয়া রাজা পিছু হটলেন বীরের মত লড়াই করতে করতে। দু'হাত তুলে চীৎকার করে বললেন মনে করো না তোমরা জিতে গিয়েছ। আমাদের ঐ জায়গা তোমাদেরকে ছাড়তেই হবে। ভেঙে গুড়িয়ে যাবে তোমাদের দুর্গ। আজ তোমাদের জয়। কিন্তু মনে রেখ, এর পরই আমাদের পালা।

পাহাড়ে উঠে তিনি তাঁর বেশবাশ বদলে ফেললেন। শোক-বসনে ঢেকে নিলেন নিজে। কয়েক গজ শাদা সূতী কাপড়ে তৈরি পোষাক তাঁর পরনে। মাথার অংশের মাঝখানে ফাঁক। ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকে চুল।

এ কাপড়ে তিনি ছুটে গেলেন পাণ্ডুয়া বাজারে। এমন পোষাকে খাসিয়া রাজাকে দেখে পাণ্ডুয়া বাজারে আশুন জ্বলে উঠল। চারদিকে হৈ-হৈ রব। খাসিয়ারা সব চলে গেল পাহাড়ে পাহাড়ে। হঠাৎ যেন সবকিছু শান্ত হয়ে গেল। খাসিয়াদেরকে সমতল ভূমিতে কোথাও দেখা যায় না। আশপাশেও কাউকে না। শান্ত নিস্তরঙ্গ পাহাড়ি জীবন যেন।

কিন্তু তলে তলে চলছে আয়োজন। পাহাড়ের শিলায় শিলায় ঝলসে উঠছে আশুন।

লিভসে সাহেবের কাছে খবর পৌঁছে গেল। দুর্গকে কেন্দ্র করে খাসিয়া রাজার সাথে কোম্পানির লোকদের বিবাদ হয়েছে। এখন অবশ্য সবকিছু শান্ত। রবার্ট লিভসে আশ্বস্ত হতে পারলেন না। তিনি মেলামেশা করেছেন খাসিয়াদের সাথে। তাদের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ সব কিছুই জানা। তিনি তার সাধের পাণ্ডুয়া দুর্গে আরো সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় রেখে।

পাহাড় থেকে নেমে এল খাসিয়ারা। ঝাঁকে ঝাঁকে। হাতে তীর-ধনুক। অস্ত্রপাতি। নেমে এলেন খাসিয়া রাজাও।

তারা আক্রমণ করলেন দুর্গ। খাসিয়া রাজা টেনে বের করলেন হাবিলদারকে। বললেন তোমাকে নিরস্ত্র করব না। বাপের ব্যাটা হও তো অস্ত্র হাতে নাও। এসো, লড়াই কর আমার সাথে।

নিজেই অস্ত্র এগিয়ে দিলেন হাবিলদারের দিকে। গুরু হল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। খাসিয়া রাজার হাতে নিহত হল হাবিলদার। হাবিলদারের এক অনুচর কাপুরম্বের মত পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে হত্যা করল খাসিয়া রাজাকে।

কিছু যুদ্ধ চলতেই লাগল। হিংস্র নৃশংস যুদ্ধ। লিভসের লোকদেরকে ধরে ধরে হত্যা করা হল। তাদের মাথার চুল ও চামড়া কেটে ফেলা হল। কারো কারো মাথার খুলি কেটে অর্ধেক অংশের চুল ছেটে দুর্গের মাথায় ঝুলিয়ে রাখা হল।

এভাবে পাণ্ডুয়ার দুর্গ পরিত্যক্ত হল। রবার্ট লিভসে চুন ও চুনাপাথরের ব্যবসার লোভে আর কখনো পাণ্ডুয়ায় আসার সাহস করেননি।

পঞ্চম পর্ব

সন্দ্বীপের সংগ্রামী মানুষ



স্বর্ণদ্বীপ সন্দীপ

নোয়াখালীর পা ছুঁয়ে কানাকানি করে সাগরের ঢেউ। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। তার বুক চিরে গজিয়ে উঠেছে কতকগুলো দ্বীপ। কোনটি ছোট, কোনটি বড়। এই দ্বীপগুলো মাথায় গেঁথে গড়ে উঠেছে সন্দীপ। অপরূপ শোভা তার। সাগর জাগিয়ে দিয়েছে উর্বর মাটি। সে মাটি জন্ম দিয়েছে শ্যামল বৃক্ষরাজি। তেমনি ফসলের আবাদ। পেশায় অধিকাংশই কৃষিজীবী। অন্য পেশার লোকজনও রয়েছে কিছু কিছু।

ভারতীয় পাঠানরা প্রথম আকৃষ্ট হয় সন্দীপের প্রতি। তাদের কাছে এ যেন সাগরের বৃকে লুকানো এক প্রাকৃতিক রত্নভাণ্ডার। স্বর্ণদ্বীপ। এ থেকেই এর নাম এসেছে সন্দীপ। এক সময় মোগলরাও দল বেঁধে এসে এ দ্বীপমালায় আবাস গড়ে তোলে। ১৫৭৪ সালে মোগলরা যখন পূর্ববঙ্গের উপর তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তখন সন্দীপও তাদের অধিকারে নিয়ে আসে।

কিন্তু স্বর্ণদ্বীপ সন্দীপে সোনার মানুষও রয়েছেন যারা স্বাধীন থাকতে পছন্দ করেন, শাসক ও উচ্চবর্ণের লোকদের অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

তেমনি একজন দেলোয়ার খাঁ। ইতিহাসে তার নাম দিলান হিসেবেই পরিচিত। শৈশবে তিনি এতিম ছিলেন। মা-বাবার স্নেহের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। কঠোর বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর জীবন নির্বাহ করেছেন। এ জীবন কষ্টের এবং কষ্ট থেকে জেগে ওঠার। একজন অদ্রলোক দাস হিসেবে তাকে প্রতিপালন করেন।

এখানে কাজ করতে করতেই তাঁর চোখের আঁধার কেটে যেতে থাকে। জেগে উঠতে শুরু করে নতুন চিন্তাধারা।

এক আল্লাহর দুনিয়া। তার নেয়ামত ছড়ানো চারপাশে। সবকিছুই মানুষের ভোগের জন্য। আল্লাহ সূর্যের আলো থেকে কাউকে বঞ্চিত করেননি, বাতাস প্রবাহের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেননি কোন বৈষম্য। কিন্তু জমি-জমা, সম্পদ, অর্থ-বৈভবের ক্ষেত্রে বৈষম্য কেন? বিশেষ করে মাঠের ফসল কৃষক-কামলারা ফলায় তাদের দেহের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে। সে ফসল সবটাই বিনা পরিশ্রমে আত্মসাৎ করে জমিদাররা। তাদেরকে কেবল তিন বেলায় তিন মুঠো খাবার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

এ এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় তাঁর সামনে। তিনি তাঁর সঙ্গের লোকদের কাছে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কোন জবাব পাননি। প্রশ্ন করেছেন অন্য কৃষকদের, রাখালদের। কারও কাছ থেকে সদুত্তর মেলেনি। সবাই কপালের উপর দোষ চাপিয়ে সান্তনা খুঁজেছে।

কিন্তু সান্ত্বনা পাননি দিলান। তার কাছে একটা কথাই মনে হয়েছে, আল্লাহতালার মানুষের মধ্যে কোন বৈষম্য করেননি। আসলে এ বৈষম্য সৃষ্টি করেছে বলবান

বিত্তশালীরা তাদের ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে। ক্ষমতার দাপট কি কিষণ-মজদুররা দেখাতে পারে না? তারাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ!

প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেন দিলান ওরফে দেলোয়ার খাঁ। আলোড়িত হয় রাখালরা। বিস্তীর্ণ ঘেসো মাঠে তারা বলদ-ষাঁড়-গাই-ছাগল-ভেড়া চরায়। সন্দীপের মানচিত্র তাদের মুখস্ত। স্পন্দন সৃষ্টি হয় কিষানদের মধ্যে। দিলানের কথা তো তাদেরই অন্তরাঙ্গার কথা, প্রাণের ধ্বনি।

তাদের নিজেদের মধ্যে কথা হয়। তারা মেনে নেয় দিলানের যুক্তি। কিন্তু তারপর? তারপর দ্বীপের সব কৃষক পরামর্শ সভায় বসে। নিক্তি দিয়ে ওজন করে বিচার করে দেলোয়ার খাঁর কথা।

ক্রমেই দিলানের দল ভারি হতে থাকে। রাখাল ও কৃষকদের নিয়ে গড়ে ওঠে এক শক্ত-পোক্ত বাহিনী। তাদের নেতা দেলোয়ার খাঁ। মোগলদের বিরুদ্ধেও তারা অবস্থান নেয়। সন্দীপে মোগল শাসনের অবসান ঘটে। পঞ্চাশ বছরের জন্য সেখানে দেলোয়ার খাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষক-রাজ।

আরু তোরাপের প্রতিরোধ

দেলোয়ার খাঁর মৃত্যু সন্দীপে কৃষকদের স্বাধীনতা বিপন্ন করে তোলে। সন্দীপ রাজস্ব আদায়ের একটি ভাল ক্ষেত্র। অথচ সেই রাজস্ব থেকেই বঞ্চিত মোগল শাসক। বাংলাদেশের মোগল রাজস্ব সচিব এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন। বুদ্ধি তাঁকে একটা বের করতেই হবে। রাজস্ব সচিবকে বলা হত আহাদদার। তিনি সন্দীপের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের বশে আনার জন্য একটা নিয়ম চালু করলেন। তাদের সঙ্গে সন্দীপের ইজারা বন্দোবস্ত করেন। ইজারাদাররা সম্পন্ন লোক। চামাবাদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র কমই। বরং যারা চামাবাদের কাজ করে তাদের ওপর ছড়ি ঘুরাতেই অভ্যস্ত। তাদের কাজ হল কৃষক ও অন্যান্য পেশাজীবী প্রজা সাধারণের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা এবং তার একটা নির্ধারিত অংশ রাজস্ব সচিব বা আহাদদারের কাছে জমা দেয়া।

কিন্তু দেলোয়ার খাঁ সন্দীপের কৃষকদের যে মন্ত্র শিখিয়ে নিয়েছেন, তা তারা এত সহজেই ভুলে কি করে? সন্দীপ থেকে ইজারাদাররা তেমন একটা রাজস্ব আদায় করতে পারে না। তা জমাও পড়ে না আহাদদারের তহবিলে। আহাদদার তখন ভিন্ন পথ ধরলেন। কৃষক-নেতা দেলোয়ার খাঁ ওরফে দিলান নেই, রয়েছেন তাঁর জামাই চাঁদ খাঁ। চাঁদ খাঁর মধ্যে নেই আবার দিলানের স্বাধীন চেতনা-বোধ। সন্দীপের সর্বময় কর্তা হয়ে কৃষক-প্রজা সাধারণের ওপর ছড়ি ঘুরাতে তাঁর বড় সাধ। মোগল শাসক এ সুযোগটাই গ্রহণ করেন। তাঁরা দেখলেন শ্বশুরের নাম ভাঙ্গিয়ে জামাই চাঁদ খাঁ সন্দীপের

ওপর অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। মোগল শাসক দলে ভিড়িয়ে নিলেন চাঁদ খাঁকে। তাঁর হাতেই সমর্পণ করলেন সন্দীপের সব ধরনের রাজস্ব আদায়ের ইজারাদারি। সন্দীপ এক বিস্তৃত পরগনা। এত বড় পরগনা থেকে একা রাজস্ব আদায় করা চাঁদ খাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি ইজারাদারি ভাগ করে দিলেন কয়েকজনের মধ্যে। কিছু নিজে রাখলেন। বাকিগুলো ভাগ করে দিলেন তাঁর দু'জন আত্মীয় ও কানুনগো দফতরের এক কর্মচারীর মধ্যে।

এভাবেই কৃষকের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। তাদের ওপর গজিয়ে ওঠে মুষ্টিমেয় কয়েক ঘর জমিদার। তারা রাজস্ব আদায় করত। তার নির্ধারিত অংশ পৌছে দিত আহাদদারের তহবিলে। ইংরেজ শাসনের শুরুতেও এ ব্যবস্থা বহাল ছিল।

সন্দীপের শেষ আহাদদার গোকুল ঘোষাল। খিদিরপুরের ভূকৈলাসের ঘোষাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অত্যন্ত সেয়ানা লোক।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় বাংলা-বিহার ইংরেজ গভর্নরের অফিসের কেরানি হিসেবে। তিনি আবার গভর্নর সাহেবের 'বেনিয়ান'ও ছিলেন।

গোকুল ঘোষাল অতিশয় ধড়ি বাজ। তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্মচারী বিষ্ণুচরণ বসুকে দিয়ে একটি কোম্পানি গঠন করেন। গভর্নরের আনুকূল্যে এই কোম্পানির নামেই সন্দীপের আহাদদারি গ্রহণ করা হয়।

সন্দীপে আবির্ভাব ঘটে গোকুল ঘোষালের। পেছনে তাঁর ইংরেজদের অস্ত্র-শক্তি। দণ্ডমুণ্ডের কর্তার আহাদদার। বিচারের ক্ষমতাও তাঁর। কৃষকদের শেষ রক্তবিন্দু নিংড়ে হলেও গোকুল ঘোষাল খাজনা আদায় করতে শুরু করেন। তাঁর বিরুদ্ধে টু-শব্দ করারও কেউ নেই। বসোপসাগরে কার যে লাশ কখন ভেসে যাবে কেউ বলতে পারে না। এভাবে গোকুল ঘোষাল সন্দীপের ত্রাস ও একচ্ছত্র মালিক হয়ে উঠলেন।

আবু তোরাপের কাছে কৃষকরা এসে ধরনা দিল। গোকুল ঘোষালের জুলুমবাজি আর তো সহ্য হয় না। এর তো একটা প্রতিকার করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের গোলামিও করতে হবে?

আমাদের কি কোন নেতা নেই? সাহস শৌর্য সব কি আমরা হারিয়ে বসেছি?

দেলোয়ার খাঁ আমাদের যে স্বপ্ন দেখিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বংশে সে স্বপ্ন দেখার কোন লোক কি আজ বেঁচে নেই?

আবু তোরাপ কৃষকদের অভিযোগ শুনলেন। এসব অভিযোগ অবিশ্বাস করার নেই কিছু। সব কিছুই তো তাঁর চোখের সামনেই ঘটে যাচ্ছে। দু'তিনটি ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি নিজেও অপদস্থ হয়েছেন। আর তাঁকে শেলের মতো বিধছে কৃষকদের প্রশ্নগুলো।

তিনি বললেন তোমরা চলে যাও। আমি একটু ভেবে নিই।

কৃষকরা চলে গেল।

আবু তোরাপ আর ভাববেন কি? তাঁর বংশধারা, টগবগে রক্তের উদ্দামতা তাঁকে কোন্ পথে টেনে নিয়ে যাবে, তা তিনি পরিষ্কারই বুঝতে পারছেন। তবু একটু সময় নিলেন, নিজের মনটাকে গুছিয়ে নিতে।

দেলোয়ার খাঁ ওরফে দিলানের জামাতা চাঁদ খাঁ। তাঁর বংশের চতুর্থ পুরুষ আবু তোরাপ চৌধুরী। চাঁদ খাঁর জমিদারির এক টুকরো অংশ তিনিও পেয়েছিলেন। জমিদারি তাঁর খুব একটা বড় নয়। কিন্তু শক্তি সাহসে তিনি তখন বিখ্যাত। সবার মুখে মুখে তাঁর নাম। তাঁর জমিদারিতে যেসব প্রজা বাস করে, চাম্বাবাদ করে তারা সবাই খুশি। আবু তোরাপ চৌধুরী মানসিকভাবে নিজেকে সুসংহত করে ঘোষণা দিলেন সন্দীপ আবার স্বাধীন হল। এখানে আর কারও জমিদারগিরি চলবে না। মানা হবে না কোন আহাদদারের হুকুম-আহকাম। গোকুল ঘোষাল আর তার অনুচরদের জন্য সন্দীপ নিষিদ্ধ করা হল।

অন্য জমিদাররা আবু তোরাপের প্রভাবে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হল। কিন্তু আহ্লাদিত হলেন গোকুল ঘোষাল। তিনি অনেকদিন থেকেই ওঁৎ পেতে ছিলেন কিভাবে আবু তোরাপকে শায়েস্তা করা যায়। তাঁর কর্তৃত্বও সাহসিকতাকে ভয় পেতেন তিনি। কাছে ঘেঁষতে সাহস হত না। পুরো সন্দীপ দখল করার ক্ষেত্রে এই একটি কাঁটাই ঘোষাল বাবুকে বিধত। অথচ নিজের পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে লড়ার সাহস ও শক্তি তাঁর ছিল না।

আবু তোরাপের ঘোষণা গোকুল ঘোষালের জন্য ভাল হল। সন্দীপ থেকে বিতাড়িত অন্য জমিদারদের নিয়ে তিনি অভিযোগ পেশ করলেন পুতুল নবাবের দরবারে আর ইংরেজ সাহেবদের কুঠিতে। সঙ্গে সঙ্গে সাজসাজ রব পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন নলিকেনের নেতৃত্বে বাহিনী পাঠানো হল সন্দীপে।

সন্দীপের কৃষকরাও সংঘবদ্ধ ও প্রস্তুত। আবু তোরাপ চৌধুরীর নেতৃত্বে তারা ইংরেজ বাহিনীকে রুখে দাঁড়াল। বঙ্গোপসাগর রক্তে প্রাণিত হল। যুদ্ধে আবু তোরাপ চৌধুরী শহীদ হলেন। কিন্তু সাগরের ঢেউ ফিরে ফিরে তাঁর রক্তস্নাত ফেনা ফিরিয়ে দিতে লাগল সন্দীপকে। সন্দীপবাসীরা পরাজিত হল। কিন্তু আবু তোরাপের শাহাদাতের রক্ত তাদের অন্তরাখার আগুনটিকে নিভতে দিল না।

সন্দীপের আগুন জ্বলে অনিবার্ণ

কৃষকদের হৃদয়ের আগুন নজরে পড়েনি গোকুল ঘোষালের। তিনি নিভতে পুরো সন্দীপ নিজের দখলে নেয়ার পায়তারা করেন। তিনিই হয়ে ওঠেন এ সোনার দ্বীপটির সর্বময় কর্তা। তিনি শুধু আহাদদার হয়েই বসে থাকেননি, তাঁর ছেলে জয়নারায়ণ ঘোষালকে নিযুক্ত করেন সন্দীপের কানুনগো হিসেবে। এছাড়া ছেলেকে পরগনার

ইজারাদার বানিয়ে তার নামে লবণের একচেটিয়া বন্দোবস্ত করেন। আত্মীয় ভবানীচরণকে নিযুক্ত করেন নায়েব-আহাদদার।

আবু তোরাপের শাহাদাতের পর সরকার তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। যেসব জমিদারকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাদের পুনর্বাসিত করা হয়। কিন্তু তারা গিয়ে পড়ে গোকুল ঘোষালের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে। সন্দীপের সর্বত্র গোকুলের অত্যাচার। জমিদারদের আয়-রোজগার বন্ধ। বক্তার মহম্মদ ও মহম্মদ হানিফ নামের দুই জমিদারের এলাকায় খাজনা বন্ধ হয়ে যায়। রাজস্ব বকেয়া পড়ে যায়। তা আদায়ের জন্য তাদের জমিদারি নিলামে ওঠে। গোকুল ঘোষাল তাঁর ছেলে জয়নারায়ণ ঘোষালের নামে তা কিনে নেন। এরপর তাঁর নজর পড়ে মধুসূদন চৌধুরীর জমিদারির উপর। এ জমিদারের উত্তররধিকারীকে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে জেলে ভরা হয়। জেলের ভেতরেই নির্যাতন করে তাকে কবলা লিখে দিতে বাধ্য করা হয়। এ জমিদারির আরেক শরিক ছিল এক বিধবা মহিলা। তার ওপরও গুরু হয় গোকুল ঘোষালের অত্যাচার। সে অত্যাচার ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক।

জমিদারদেরই যখন এ অবস্থা সেখানে প্রজা সাধারণ যে কী অবস্থায় রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়। কৃষকরা সর্বস্বহারা হয়ে যায়। তারা ক্রমেই গোকুল ঘোষালের গোলামে রূপান্তরিত হতে থাকে।

সন্দীপের নির্যাতিত জমিদাররা সবাই একত্রিত হয়ে বাংলার গভর্নর কার্টিয়ার সাহেবের কাছে নালিশ জানান। কার্টিয়ার তাদের নালিশের ওপর মন্তব্য লিখে মুর্শিদাবাদে নায়েব-দেওয়ান সৈয়দ রেজা খাঁর কাছে পাঠান। রেজা খাঁ সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে আগের শর্ত মেনে সন্দীপের জমিদারদের জামিদারি ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দেন। গোকুল ঘোষাল ঘড়েল লোক। কেমন করে সরকারি আদেশ পালেট দেয়া যায় তাঁর তা খুব ভাল করেই জানা। এদিকে ইংরেজদের আশীর্বাদ রয়েছে তাঁর সঙ্গে। তাঁর নানা কারসাজিতে সরকারি আদেশ বাতিল হয়ে যায়।

এবার গোকুল ঘোষাল মুক্তকচ্ছ। তাঁকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। পেছনে তাঁর বিশাল ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইংরেজ শাসক। সন্দীপের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ল। এ কান্নাতেই ঘোষাল পরিবার আর তাঁর অনুচরদের আনন্দ। সম্পন্ন প্রজা যারা তারা ভিখেরি হয়ে গেল, গরিবরা অভুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে লাগল। যারা গোকুল ঘোষালের অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এল, লুটপাটে বাধা দিল, তারা ঘোষালের বিবেকহীন বাহিনীর উৎপীড়নে রক্তাক্ত হতে লাগল। কেউ কেউ প্রাণ বিসর্জন দিল। বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটায় কত যে লাশ ভেসে গেল তার হিসাব কেউ কষতে পারল না। সোনার দ্বীপ যেন শ্মশানভূমি হয়ে গেল। গোরস্থানের নীরবতা যেন সন্দীপকে গ্রাস করল। অনেকেই পালিয়ে গেল নোয়াখালীতে।

পড়ে পড়ে মার খেতে খেতে কৃষকরা তাদের প্রথম প্রতিবাদ জানাল নীরব ঘৃণায়। ঘৃণা গোকুল ঘোষালকে। ঘৃণা ইংরেজ শাসককে। এ ঘৃণা জমতে থাকল মনের

গহীনে। ঘৃণা নয়, যেন বারুদ জমছে তাদের অন্তরে। এখন শুধুই বিস্ফোরণের অপেক্ষায়। সত্যি সত্যি একদিন বিস্ফোরণ ঘটল। তার স্কুলিস ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র সন্দ্বীপ পরগনায়।

জেগে উঠল তারা। প্রকৃতি নিল সশস্ত্র প্রতিরোধের। গ্রামে গ্রামে সভা হল। ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠল। ইংরেজ রাজাকে আর এক পয়সাও খাজনা দেয়া হবে না। খাজনা দিয়ে আমরা আর অত্যাচার-জুলুম কিনতে চাই না। খাজনা বন্ধ।

গোকুল ঘোষালের লোকেরা খাজনা আদায় করতে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাদের শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়। পেয়াদা আর পুলিশ পাঠানো হল। গণপিটুনিতে হাত-পা ভেঙ্গে তাদের ফিরে আসতে হল। যেখানেই গোকুল ঘোষালের লোক খাজনা আদায় করতে যায়, সেখানেই কৃষকদের দলবদ্ধ প্রতিরোধ। গোলযোগ হয়। হাসামা হয়। সংঘর্ষ হয়। ছোটখাটো যুদ্ধবিগ্রহও হয়। সন্দ্বীপের সর্বত্র।

গোকুল ঘোষালের আহাদদারি আর জমিদারি টেকে না।

এদিকে বিক্ষুব্ধ জমিদাররাও যোগ দিয়েছে কৃষকদের সঙ্গে। কৃষকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন জমিদার মহম্মদ নাইম।

গোকুল ঘোষাল তাঁর প্রভু ইংরেজদের দ্বারস্থ হলেন। আবেদন জানানলেন সন্দ্বীপের আগুন নেভাতে সৈন্য পাঠানোর জন্য।

১৭৬৯ সালের শেষ ভাগ। ইংরেজ বাহিনী হানা দিল সন্দ্বীপে। তাদের রুখে দাঁড়াল কৃষকরা। ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তারই মোকাবিলায় বুক পেতে দিল সন্দ্বীপবাসী। রক্তে ভেসে গেল সন্দ্বীপ। রক্তের স্রোত আবারও মিশে গেল বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ে। কিন্তু আগুন আর নেভে না। সন্দ্বীপে আগুন জ্বলতেই থাকে।

ষষ্ঠ পর্ব

ফকির - সন্ন্যাসীদের গল্প



দেশপ্রেমের টানে

ইংরেজ কোম্পানির বাহিনী আধুনিক সমরসজ্জায় সুসজ্জিত। তাদের সৈন্যসংখ্যাও বিপুল। আধুনিক রণ-কৌশলে প্রশিক্ষিত। অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে সাহসী বিপ্লবীদের হাতে তেমন কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। তারা পেশাদার যোদ্ধাও নয়। তারা ইংরেজ খেদাও যুদ্ধে যোগ দিয়েছে দেশপ্রেমের টানে। তারা সাধারণ কৃষক প্রজা, তাঁতি, জেলে, খেটে খাওয়া মানুষ, ফকির সন্ন্যাসী। আধুনিক রণচাতুর্য তাদের জানা নেই। কিন্তু যুদ্ধে তাদের জিততেই হবে—এই দৃঢ়প্রত্যয় তাদের চোখে মুখে।

১৭৬৬ সাল। কোচবিহার রাজ্যের রাজবংশের উত্তরাধিকারীগণ সাহায্য চেয়েছে বিপ্লবীদের। সেনাপতি রুদ্রনারায়ণ। সে পুরো রাজ্য গিলে খেতে চায়। এজন্য সাহায্য চেয়েছে ইংরেজদের। বিনিময়ে তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধে দেবে। ইংরেজরা বিবেচনা করে দেখল, কোচবিহার কোম্পানির দখলে আনার এই মোক্ষম সময়। লেফট্যানেন্ট মরিসনের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী এগিয়ে গেল।

উত্তরবঙ্গ তখনই ইংরেজ-বিরোধী বিপ্লবীদের ঘাঁটি। কোচবিহারের রাজবংশ তাদের কাছে এই বিপদে সাহায্যের জন্য বার্তা পাঠান। ইংরেজরা পৌছার আগেই বিপ্লবীরা কোচবিহার দখল করে নিল।

দিনহাটা। এখানেই মুখোমুখি হল দুই বাহিনী। মরিসনের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী। আর রামানন্দ গোসাই-এর নেতৃত্বে ফকির-সন্ন্যাসীদের দল। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। পরাজিত হল ফকির-সন্ন্যাসীরা।

ক'দিন পর আটশ' ফকির-সন্ন্যাসীর দল আবার হামলা করল মরিসনের বাহিনীর উপর। ইংরেজদের কামানের তোপে এবারও তাদেরকে পরাজয় মানতে হল।

ফকির-সন্ন্যাসীরা বুঝতে পারল, এভাবে মুখোমুখি যুদ্ধে তাদেরকে বারবার পিছুই হটেতে হবে, জেতা আর হবে না। বিজয় নিশ্চিত করতে হলে তাদেরকে নতুন কৌশল নিতে হবে। আর এই কৌশলটাই হল গেরিলা যুদ্ধের কৌশল। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল।

বিদ্রোহীরা পরাজিত। ইংরেজরা উল্লসিত। মূলসুদো উপড়ে ফেলতে হবে বিদ্রোহীদের। চারদিকে তারা ফকির-সন্ন্যাসীর খোঁজে টুঁ মারতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে তারা ঢুকে গেল গ্রামের ভেতর।

ফকির-সন্ন্যাসীরা গ্রামেরই লোক। গ্রামবাসীরা তাদের আত্মীয়-স্বজন। ইংরেজরা গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করে। আর দেখতে পায়, গ্রামের লোকরা ফাঁস করে ফণা তুলে ধরছে। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ছদ্মবেশী ফকির-সন্ন্যাসীরাই নির্মূল করে দিল গ্রামে অনুসন্ধানকারী ইংরেজ দলটিকে। এভাবে ইংরেজ বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে।

আগস্ট মাস। চারশ' ফকির-সন্ধ্যাসী এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে মরিসনের নেতৃত্বের ইংরেজ বাহিনীর উপর। পরাজিত শত্রুর এই আকস্মিক আক্রমণে হকচকিয়ে যায় ইংরেজ বাহিনী। তাদের অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনী মরীচিকার পেছনে বহুদূর এগিয়ে গেছে। আর এদিকে ফকির-সন্ধ্যাসীরা গোপন স্থান থেকে হঠাৎ হামলা চালিয়েছে তাদের উপর। মুক্ত তরবারি হাতে তারা ইংরেজদের ঘিরে ফেলল। শুরু হল প্রচণ্ড যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর উপর নামিয়ে আনল চূড়ান্ত পরাজয়। মরিসন কোনরকমে পালিয়ে বাঁচল। ক্যাপ্টেন রেনেলের আর্মেনীয় সহকর্মী নিহত হল। অ্যাডজুটেন্ট মারাত্মক আহত হল। আর তরবারির আঘাতে ক্যাপ্টেন রেনেলের দু'টি হাতই অকর্মণ্য হয়ে পড়ল।

‘দুশমনকে ভেতরে টেনে আন’

বিপ্লবীদের আরেকটি রণকৌশল ছিল, দুশমনকে উকিয়ে নিজেদের বৃত্তের ভেতর টেনে আনা এবং এরপর ব্যবস্থা গ্রহণ।

উত্তরবঙ্গ ছিল ফকিরদের প্রধান ঘাঁটি। তারা হিমালয়ের পাদদেশের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে এসে সমবেত হয়। তারা বুঝতে পেরেছিল, তাদের সাথে ইংরেজদের সংঘাত অনিবার্য। এজন্য তারা আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি নেয়। জলপাইগুড়ি জেলায় তারা একটি দুর্গ বানায়। দুর্গটিকে মাটির প্রাচীর দিয়ে আর এর চারপাশে ট্রেঞ্চ কেটে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

১৭৬৬। ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধি মর্টেল লোকজন নিয়ে কাঠ কাটতে আসে উত্তরবঙ্গ ও নেপাল সীমান্তে। ফকিররা তাদেরকে গ্রেফতার করে। বিচার করে প্রাণদণ্ড দেয়।

খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্য আসে এর ব্যবস্থা করতে। ফকিররা সেনাদল দেখে বুঝতে পারে, এদের মোকাবিলায় তাদের বিজয় আসবে না। তারা গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করল। অগত্যা ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জিকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হল।

১৭৬৯। ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে আগের চাইতেও বড় আরেকটি সেনাদল এল ফকিরদের তৎপরতা নির্মূল করতে। এবারও ফকিররা যুদ্ধ এড়িয়ে আরো উত্তরে সরে গেল।

এর ক’দিন পর। শীত নামি-নামি করছে। এসময় ফকির বাহিনী বিপুল বিক্রমে ইংরেজ বাহিনীর উপর চড়াও হয়। ইংরেজদের উত্থাপন করতে করতে তারা রংপুর পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

ম্যাকেঞ্জির বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য লেফটেন্যান্ট কিথ-এর নেতৃত্বে বিরাট ইংরেজ বাহিনী এগিয়ে আসে। ইংরেজ দলে সেনাশক্তির নতুন সমাবেশ দেখে ফকিররা আবার পিছিয়ে যায়। তাদের অনুসরণ করার জন্য ইংরেজদেরকে তারা প্রলুব্ধ করে। ইংরেজ বাহিনীকে আরো ভেতরে তাদের আওতাধীন বৃত্তে টেনে নেয়াই ছিল উদ্দেশ্য।

ডিসেম্বর মাস। নেপাল সীমান্ত। মোরাজ আঞ্চল। এখানে ফকিররা তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতর্কিত হামলা। ইংরেজ বাহিনী সামলে উঠতে পারল না। তারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হল। নিহত হলেন সেনাপতি লেফটেন্যান্ট কিথ।

সপ্তম পর্ব

আরো লড়া কুমানুষের গল্প



বাঁচা-মরার অর্থ

বেনেট সাহেবের ভাগ্য ভাল নয়।

বেনেট সাহেব রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় ইংরেজ কুঠির পরিচালক।

মার্চ ১৭৬৩। ইংরেজদের এই কুঠিটিও আক্রান্ত হন স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতার দ্বারা। নেতৃত্ব দেন ফকিররা।

সাহেবদের সাজানো সংসার মুহূর্তেই তছনছ। স্থানীয় অধিবাসীদের লুটপাট করে সাহেবরা কুঠিতে যে সম্পদ জমিয়েছিল সবই চলে যায় বিদ্রোহীদের হাতে।

আর কুঠির খোদ পরিচালক বেনেট সাহেব বন্দী হন। বিদ্রোহী বিপ্লবীরা তাঁকে পাঠিয়ে দেয় পাটনায়, তাদের কেন্দ্রে।

বেনেট সাহেবকে একজন প্রবীণ মুজাহিদ জিজ্ঞেস করলেন সাহেব, তুমি আমাদের কাছে কেমন আচরণ আশা কর?

বেনেট সাহেবের চোখ-মুখ ভয়ে-শঙ্কায় শুকিয়ে গিয়েছিল। এই প্রশ্ন শুনে তাঁর মধ্যে খানিকটা আশার আলো জ্বলে উঠল। নাইট-মাস্কেটিয়ার্সদের নভেলে যেমন কল্পিত মহানুভবতার গাল-গল্প শুনেছেন, তেমন মহানুভবতায় তিনিও যদি এ যাত্রায় বেঁচে যান, এই আশা নিয়ে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বললেন একজন বীর আরেকজন বীরের কাছে যে আচরণ পায়, একজন সৈনিক আরেকজন সৈনিকের কাছে যে ব্যবহার পায়, আমি তোমাদের কাছে তাই প্রত্যাশা করি।

বুদ্ধ মুজাহিদের মুখে তাম্বুলের হাসি দেখা গেল। বাপের সুরে তিনি বললেন বীর! সৈনিক! বড় কঠিন শব্দ। কে বীর? কে সৈনিক? তুমি?

বেনেট সাহেব একটুখানি ভড়কে গেলেন। তবুও সাহস ধরে রেখে বললেন এতে কি কোন সন্দেহ রয়েছে?

মুজাহিদ বললেন কতই-না ভাল হত, তোমাদের মধ্যে যদি একজনও বীর সৈনিকের দেখা পেতাম। সাহেব, আমরা যখন তোমাদের কুঠির উপর হামলা চালাই, তখন তুমি আর তোমার লোকজন হতবিস্ত্রল হয়ে ছুটোছুটি করেছ। তোমরা ভাবতে পারনি, মুখ বুঁজে মার খাওয়া মানুষ একদিন তোমাদেরকে এভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে। তোমরা শুধুই হামলা করতে জান, হামলার মুকাবিলা করতে জান না। তাই তোমরা ছুটোছুটি করে শুধুই পালাবার পথ খুঁজেছ। এই কি তোমাদের সাহস? বীরত্ব?

মুজাহিদ একটুখানি থামলেন। তাঁর চোখদুটো ধক ধক জ্বলছে। বললেন আর কে বলে তোমরা সৈনিক? তোমরা তো তস্কর, চোর, লুটেরা। এদেশের কিছু বেসৈমানের সাথে ষড়যন্ত্র করে আমাদের আজাদী কেড়ে নিয়েছ। চক্রান্তের মেয়েলি চাতুর্য কি সৈনিকের ধর্ম? এদেশের নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের উপর তোমরা চাবুক চালাও,

ধরে এনে ফাঁসিতে ঝুলাও—এই কি তোমাদের সৈনিকের পরিচয়? ধিক এমন কলংকিত সৈনিক পরিচয়ের।

বেনেট সাহেব অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কোন কথা বলেন না। কথা বলতে সাহস হয় না। কথায় কথা বাড়ালে প্রবীণ মুজাহিদ যদি তাদের আরো অত্যাচার-নির্বাতনের প্রসঙ্গ তুলে উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর বেঁচে থাকার ক্ষীণ আশাটুকুও ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

মুজাহিদ এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সাহেবের দিকে। বুঝিবা তাঁর প্রতিক্রিয়া দেখছেন। ধীরে ধীরে বললেন সাহেব, বেঁচে থাকার কি অর্থ? কিংবা মরে যাওয়ার?

এবারও সাহেবের কোন জবাব নেই। তিনি বুঝিবা একটু কঁপেই উঠলেন। অজানা আশংকায়।

প্রবীণ বললেন তোমাদের জন্য বেঁচে থাকার অর্থ হল আনন্দ উল্লাস লুপ্তন। আর মরে যাওয়ার মানে সব কিছুর শেষ, নিঃসীম শূন্যতা। আমাদের কাছে বাঁচা-মরার অর্থ অন্যরকম।

এবার সাহেব শুকনো মুখে, যেন কথার খেই ধরিয়ে দেয়ার জন্য বললেন কি রকম?

মুজাহিদের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাঁচা-মরা উভয় স্বপ্নে তাঁর চোখ-মুখ যেন আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি অদূরে দাঁড়ান এক তরুণের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তরুণের এক হাত কাটা। অন্য হাতে উঁচিয়ে আছে নাস্তা তলোয়ার। প্রবীণ বললেন আমাদের কাছে বাঁচা মানে ঐ যুবকের উদ্দীপনা। ওর কাছে বেঁচে থাকার অর্থ হল আজাদী আর আজাদীর জন্য জেহাদ করা। জেহাদে সে তার এক হাত উৎসর্গ করেছে। অন্য হাতটিকেও সে নিয়োজিত করেছে জেহাদে। ওর কাছে, আমাদের কাছে মৃত্যুর অর্থ হল শাহাদাত, জেহাদ করতে করতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। জীবন কিংবা মৃত্যু, দু'টিই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা কোন কিছুতেই কিছু হারাই না—হারানোর কিছু নেই।

আবার কটাক্ষের হাসি খেলে গেল তাঁর ঠোঁটে। জিজ্ঞেস করলেন সাহেব, তুমি বাঁচতে চাও, না মরতে?

বেনেট সাহেব ধরা গলায় বললেন : আমাকে তোমরা মেরো না। বিলেতে আমার পরিজনরা রয়েছে। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমি ওদের কাছে ফিরে যাব।

প্রবীণ মুজাহিদ বললেন : কিন্তু রক্তক্ষণ তো শোধ হবে না। তোমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। তুমি বাঁচবে মানেই এই জমিনের উপর একটা পরগাছা রক্ত চুষে বেড়াবে। এখন প্রশ্ন একটাই, তুমি কিভাবে মরতে চাও? অবশ্য যেভাবেই মরো না কেন, তোমার মৃত্যু পৃথিবীর জন্য কোন অর্থ বহন করবে না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেই তুমি অর্থহীন জগতে বিলীন হয়ে যাবে।

বেনেট সাহেব আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করে শিউরে উঠলেন।

কামানের তোপে বিপ্লবের জয়গান

১৭৬৪। ব্যারাকপুর। বেঙ্গল আর্মি।

বিচার হয়েছে চব্বিশজন দেশী সিপাইয়ের। ওঁদের অপরাধ, ওঁরা অধিকারের কথা বলেছেন। ছাপড়া মিলিটারী কোর্ট এক লহমায় রায় দিয়েছে, সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ সৃষ্টির অপরাধে চব্বিশ জনকে জীবন দিতে হবে। তাঁদের প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে প্রকাশ্যে, জনসমক্ষে। এঁদের দেখে অন্যরা শিক্ষা নেবে, বিদ্রোহের শাস্তি কত ভয়ংকর।

একজন গোরা সিপাই মাসে বেতন পায় চল্লিশ টাকা। আর একজন দেশী সেপাই মাসিক বেতন মাত্র ছয় টাকা।

গায়ের রঙেই শুধু ওঁদের দু'জনের মধ্যে তফাত। এছাড়া আর কিছুতেই নয়। দেশী সিপাইরা কাজে-কর্মে বিলেতী সাহেব-সিপাইদের থেকে এতটুকুও পিছিয়ে নেই। একই পেশা। একই পদমর্যাদা। একই কাজকর্ম। শুধু গায়ের রঙের তফাত। আর তফাত বেতনের। কেন? এই প্রশ্ন তুলেছিলেন বেঙ্গল আর্মির তরুণ দেশী সিপাইরা। আওয়াজ তুলেছিলেন, এ পার্থক্য চলতে পারে না। চলতে দেয়া যায় না।

সাহেব-অফিসাররা চুক্তির কথা বলেছিল। দোহাই দিয়েছিল আইনের।

বিপ্লবী সিপাইদের এক কথা বঞ্চনার চুক্তি মানি না। বৈষম্যমূলক আইনের পরোয়া করি না।

কোম্পানির সেনাবাহিনীতে প্রথম শৃঙ্খলা। প্রথম বিদ্রোহ। ধমক-ধামক দিয়ে ওঁদেরকে নিরস্ত করা গেল না। তখন বেছে বেছে নেতা গোছের চব্বিশ জনকে গ্রেফতার করা হল। তারপর বিচারের প্রহসন। রায় প্রাণদণ্ড।

সারিবদ্ধ শত শত সিপাহীদের মাঝখান দিয়ে ওঁদের চব্বিশজনকে আনা হল বধ্যভূমিতে। ওঁদের পায়ে শেকলের বেড়ি। কিন্তু মুখে উদ্দীপ্ত হাসি। শৃঙ্খলিত দাস-জীবনের চাইতে মুক্ত মৃত্যু অনেক ভাল।

ওঁদের সামনে চারটি কামান। শীতল বুকে গোলা-বারুদের উত্তাপ নিয়ে অপেক্ষা করছে বিস্ফোরণের।

মেজর জেনারেল মুনরো আদেশ কার্যকর করার ইঙ্গিত দিলেন। বিদ্রোহী চার সিপাইকে ধরে এনে বাঁধা হল চার কামানের মুখে। মুহূর্তে তোপের মুখে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেলেন চারজন অকুতোভয় বিপ্লবী। এমনভাবে চারজন চারজন করে চব্বিশজন।

কামানের তোপে বিপ্লবীদের ছিন্নভিন্ন দেহ উড়তে উড়তে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল: আমাদের মৃত্যুতে লেখা হোক তাদের সর্বনাশ। খতম হোক ইংরেজ রাজ।

যোদ্ধার মুণ্ড

নরহরি চৌধুরী। মেদিনীপুরের বলরামপুরের জমিদার। পিতা শত্রুঘ্ন চৌধুরী। প্রজা পীড়নে ও গুপ্তহত্যায় দু'জনই খ্যাতিমান। ইংরেজ রাজত্বকালে তার দাপট আরো বেড়ে যায়।

বলরামপুর জমিদারীর কদারকুণ্ড পরগনায় ঘড়ই উপজাতিদের বাস। অনুন্নত চাম্বাস তাদের প্রধান জীবিকা। চৌধুরীদের অত্যাচারে ঘড়ইরা আর নিরীহ থাকেনি, বারবার বিদ্রোহ করেছে। এভাবেই তারা যোদ্ধায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

১৭৭৩ সাল। ঘড়ইরা বিদ্রোহ করে। দমন করতে আসে জমিদার নরহরি চৌধুরী। এটি তার পুরোন অভিজ্ঞতা। মূর্খ ঘড়ইদের কিভাবে নির্মূল করা যায় সে কলাকৌশল রঙ। তার বাবা শত্রুঘ্ন চৌধুরী যখন জমিদার ছিলেন তখন ঘড়ইরা এরকম বিদ্রোহ করেছিল। এ বিদ্রোহ দমনেরও দায়িত্ব পড়েছিল নরহরি চৌধুরীর উপর। তার কৌশলের কাছে ঘড়ই বিদ্রোহীরা নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। ঘড়ইরা সাহসী ও বীর। মুখোমুখি লড়াইতে তাদের পরাজিত করা কঠিন। এমনিতে তারা শাস্ত। খাজনা দিতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু জমিদারদের অবিবেচকের মত খাজনা ধার্য, অকারণ নির্যাতন, জুলুমবাজি—এসব তারা মানতে নারাজ। তার উপর জমিদার বাবু ইংরেজ সাহেবদের গোলাম। দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়েছে।

ঘড়ইরা প্রতি বছর কার্তিক মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে তাদের দলপতির ঘরে সমবেত হয়। কর দেয়। সেদিন রাতেও তারা সমবেত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল না কোন যুদ্ধের মনোভাব। হাতে ছিল না কোন অস্ত্র।

ইঠাৎ তাদের ঘাড়ের উপর চড়াও হয় নরহরির বাহিনী। খালি হাতেই রুখে দাঁড়ায় ঘড়ইরা।

এমনি এক যোদ্ধাকে ধরে বেঁধে আনা হয় নরহরির সামনে। জমিদারকে দেখে এতটুকু বুক কাঁপে না ঘড়ই যোদ্ধার।

নরহরি চৌধুরী সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন খুব তো তেজ দেখালি। এবার বল তো তোর কি হবে?

যোদ্ধা বুক টান টান করে দাঁড়াল। বলল কাপুরুম জমিদারের কাছে বীর ঘড়ইদের কি আর হবে—মুণ্ড কাটা যাবে।

তোর ভয় করছে না?

ভয় করবে কেন? ভীতু তো তারা যারা গোপনে নিরস্ত্র লোকদের উপর হামলা চালায়। যারা বিদেশী বেনিয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলায়।

কথা শুনে গা জ্বলে যায় নরহরি চৌধুরীর। বলেন তোরা ঘড়ই জাত সিধা হবি না কখনো।

আমরা সিধা-সাধা মানুষ। আমাদেরকে যুদ্ধে নামিয়েছ তোমরাই। তুমি আর তোমার বাবা।

এ যুদ্ধের পরিণতি কি তোরা জানিস না?

মুখোমুখি যুদ্ধ হলে তোমরা পালাতে। কিন্তু কাপুরুষ তোমরা অসতর্ক মুহূর্তে পেছন থেকে হামলা চালাও।

মুণ্ডুমারী আর গর্দানমারী চিনিস?

চিনব না কেন? ঐ দু'টি স্থান আমাদের গর্ব। তোমার বাবার জমিদারীর সময় তুমি এই একই কায়দায় আমাদের লোকদের আক্রমণ করেছিলে। হত্যা করেছিলে আমাদের পূর্বপুরুষদের। মুণ্ডু কেটে এ জায়গায় পুঁতেছ আর গর্দান পুঁতেছ আরেক জায়গায়। ঐ জায়গা দু'টি আমাদের তীর্থস্থান, আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়।

এবার যে তোর মুণ্ডুও যাবে।

যোদ্ধার মুণ্ডু। দেখবে গর্দান থেকে কেটে ফেলার পরও সে কথা বলবে তোমাদের জুলুমের বিরুদ্ধে, ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে।

নরহরি চৌধুরীর আর ধৈর্য্যে কুলোল না। তার ইশারায় এগিয়ে এল জল্লাদ।

জমিদার ও প্রজা এককাটা

১৭৭০ সাল। মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহল বিস্তৃত বনাঞ্চল। এর সীমান্তে ঘাটশিলা। জমিদার প্রবীণ কিন্তু বিবেচক ও সাহসী। প্রজাদের সাথে তার সুসম্পর্ক। মঙ্গলমহলের জমিদারদের মধ্যে ঘাটশিলার জমিদার সবচাইতে ক্ষমতাশালী। তার দুর্গটিও সুরক্ষিত।

জঙ্গলমহলের অধিবাসী হল চোয়াড়রা। এরা কৃষিকাজ, পশু-পাখি শিকার আর উৎপন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করে জীবন চালায়। এদের অধিকাংশই আবার স্থানীয় জমিদারদের অধীন পাইক বা সৈনিক। সৈনিক হিসেবে এরা নগদ বেতন পায় না। এদেরকে দেয়া হয় জায়গীর জমি। এ জমিগুলোকে বলা হয় পাইকান জমি। এরা তীর, টাঙ্গী, বর্শা, বাঁটুল এসব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে। কোন কোন সৈন্যদলে বন্দুকও রয়েছে।

এসব এলাকার জমিদাররা আসলে ভূস্বামী নন। তারা মোগল আমল থেকেই সরকারের ভূমি-রাজস্ব আদায় করে দিত। ইংরেজরা শাসন-ভার নিয়েই রাজস্ব বাড়িয়ে দিল বহু গুণ। এর বোঝা বহন করা প্রজাদের জন্য কঠিন। এ ধরনের বাড়াবাড়ি জঙ্গলমহলের জমিদাররাও মেনে নিতে পারেনি। ইংরেজরা এটাকে বিদ্রোহ বলে গণ্য করল।

মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট গ্রাহাম লেফটেন্যান্ট ফারগুসনকে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দিলেন। ফারগুসন একদল সৈন্য দিনে জঙ্গলমহল অভিযানে বেরুল।

অভিযানটিকে সে যত সহজ মনে করেছিল আসলে অতখানি সহজ হয়নি। তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল চোয়াড়দের বিষাক্ত তীর ও অস্ত্রশস্ত্রের। তার উপর পাহাড়ি ব্যাধি তো রয়েছেই।

কিন্তু বীরের মত লড়াই করেও আধুনিক গোলাবারুদের মুখোমুখি পড়ে চোয়াড়দের পিছু হটতে হয়েছিল। রামগড়, লালগড়, জামবনী, শালদা, সিংভূমি, মালভূম ও বাঁকুড়ার পতনের পর চোয়াড়দের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়াল ঘাটশিলা। ঘাটশিলার বুদ্ধি জমিদার ঘোরতর ইংরেজ-বিদ্বেষী। তার কাছে ধর্ণা দিল চোয়াড়রা। জমিদার বললেন আমি তো জমিদার। তাদের মারধর করে খাজনা আদায় করি। তোরা আমার সাথে আমার হয়ে লড়াই কেন?

চোয়াড়দের মধ্যে যে বুদ্ধিমান সে জবাব দিল মেনে নিলাম, আপনি জমিদার। কিন্তু আমাদের দেশের লোক। আপনার চাইতেও খারাপ বিদেশী ঐ ইংরেজরা। ওরা আপনার জন্যও খারাপ, আমাদের জন্যও। এজন্যেই আমরা এক হয়ে লড়াই।

জমিদার হাসলেন। বললেন তাই হোক।

চারপাশে যুদ্ধের সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

বীর পুঙ্গবদের নেপথ্য পলায়ন

১৭৬৩ সাল। ঢাকা কুঠি।

সাহেব-সুবোরা সুখ-নিদ্রায় মগ্ন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে বিলেতের। এই নেটিভ-ল্যান্ড লুটেপুটে ইমারত গড়বে বিলেতের সবচাইতে অভিজাত পাড়ায়। এই স্বপ্ন-সুখে তারা বিভোর।

স্বপ্ন দেখছেন রালফ লিষ্টার। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সাত সমুদ্রের তের নদী পাড়ি দিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। সেখান থেকে ঢাকায়। এই কুঠির প্রধান তিনি। ভাগ্য গড়ায় দুর্বীর স্বপ্ন নিয়ে তিনি এসেছেন এই সুদূরে। তিলে তিলে ইংরেজদের এই কুঠিটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। কুঠির পরতে পরতে, ইটের খাঁজে খাঁজে নেটিভদের আর্থনাদ, রক্ত-মাংসের ভাঁজে ভাঁজে তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা গচ্ছিত রেখেছেন টাকা-কড়ি, সোনা-দানা, রত্ন-ভাণ্ডার। এসবই বিলেতে চালান দেয়ার অপেক্ষায়।

এই কুঠিটাকে কেন্দ্র করেই ঢাকা শহর আর তার চারপাশে গড়ে উঠেছে সাহেবদের বিশাল ব্যবসায়িক এলাকা। সাহেবদের ব্যবসায় বলি হয়েছে স্থানীয় লোকজন। বিরান হয়েছে জনপদ। জক্ষেপ নেই সাহেবদের। নেই কোন মায়ামমতা। সভ্য মানব সমাজ থেকে এই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দেশের অসভ্য বর্বর নেটিভগুলো যদি

বিলীন হয়ে যায়, তাতে সভ্যতার এতটুকু ক্ষয়-ক্ষতি নেই—এ ধারণায় বিশ্বাস করেন রালফ নিস্টারও।

ঢাকা। মশহুর মসলিন কাপড়ের এলাকা। জগতখ্যাত কারিগরদের জনপদ এই ঢাকা। মাথার ঘাম নোনা করে তারা মসলিন আর কেলিকো বস্ত্র বোনে। সাহেবরা ওঁৎ পেতে থাকে। বোনা শেষ হলেই ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয় কাপড়। কারিগরদের হাতে ধরিয়ে দেয় যে কড়ি, তা দিয়ে সূতোর দামও হয় না। তারপর আবার বায়না। আরো কাপড় বানিয়ে দিতে হবে। কম সময়ে অনেক কাপড়। দাম দেবে কি দেবে না, সে সাহেবদের ইচ্ছে। বেআইনী কাজ-ত করা যাবে না। জোর করে অজানা চুক্তিপত্রের উপর কারিগরদের টিপসই করিয়ে নেয়া হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই ধরে আনা হয় কুঠিতে। তারপর সভ্য জাতির উদ্ভাবিত বর্বরতম নির্যাতন। অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে কারিগররা। ছেড়ে দিতে চায় কাপড়-বোনার জাত-পেশা। শুনবে কেন সাহেব? তাদের যে কাপড় প্রয়োজন। কাপড় দিয়ে হবে ব্যবসা। ইউরোপের অভিজাত রমণীরা ভারতীয় মসলিনে সেজে উঠবে। লীলা-লাস্যে হাসিয়ে তুলবে ইউরোপকে। শেষ-মেষ কারিগরদের কেউ কেউ বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলে। আঙ্গুল কেটেও নিস্তার নেই। মসলিন চাই। না হলে কারাবাস। নির্যাতন। আর্তনাদে কেঁপে ওঠে কুঠিবাড়ি।

অনেক কারিগর আত্মরক্ষার জন্য বনে-জঙ্গলে পালায়। রেমন্ডস সাহেবের মতে, এক-ভূতীয়াংশ বনে পালিয়েছিল।

সাহেবদের অগোচরে বনে-জঙ্গলে জ্বলে ওঠে আগুন। বিদ্রোহের আগুন। সে আগুনের আঁচ পায় না সাহেবরা।

জঙ্গলেই দেখা ফকিরের সাথে। ঘরছাড়া ফকির। আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে মানে না। কারিগরদের মধ্যে বিপ্লবের স্কুলিঙ্গ ছড়ান তিনি। ওরা সভ্য জাতির মানুষ নয়, ঐ ইংরেজরা। ওরা তস্কর। হরণ করেছে আমাদের স্বাধীনতা। লুণ্ঠ করেছে আমাদের সম্পদ। ওদের ভয়ে কারিগররা কেন বনে-জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াবে? ওদেরকে তাড়াতে হবে। এদেশের মানুষ এক জোট হলে ওরা পালানোর পথ পাবে না। সাহেবদের ঐ পাপ-কুঠি ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর সাথে সাহেবদের স্বপ্ন-সাধ।

কুঠিবাড়িতে সাহেবরা যখন স্বপ্ন-ঘুমে বিভোর, তখন কুঠির চারদিকে নিঃশব্দে এসে সমবেত হল বিপ্লবীরা। হঠাৎ বিপ্লবীদের উচ্চকিত শ্লোগানে কেঁপে উঠল কুঠিবাড়ি। সচকিত হয়ে উঠল কুঠিবাড়ি।

রালফ নিস্টার বোধ হয় তখন স্বপ্নে চাবুক পিটাচ্ছিলেন কোন হতচ্ছাড়া নেটিভের পিঠে। তিনি শুনতে পেলেন আর্তরব। এই আর্তনাদ তাঁর ভাল লাগে। ঘুম-ঘুম চোখে তিনি তাকালেন। হাতের মুঠো খুললেন। হাতে কোন চাবুক নেই। তিনি গুয়ে আছেন তাঁর আরাম-বিছানায়। বাইরে হট্টগোল। সিপাহীগুলো কি মদ খেয়ে ছল্লোড় করছে? তিনি বিছানার উপর উঠে বসলেন। বাইরে লোকজন ছুটোছুটি করছে। কমে ধমক

দেবেন বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ভয়ে তাঁর লোকজন ছোটোছুটি করছে। বাইরে কিসের হুংকার?

ব্যাপারটা বুঝতে তাঁর খানিক সময় লাগল। বুঝতে পেরেই তাঁর গলা শুকিয়ে গেল। মার-খাওয়া লোকগুলো যে এভাবে রুখে দাঁড়াবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। তাঁর সিপাহীরা, কুঠির সব লোকজন ধন-সম্পদ ফেলে কে কোথায় যে পালিয়েছে, ঠিক-ঠিকানা নেই। এভাবে ঐ ত্রুন্ধ জনতার মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় না। এই বিদেশ-বিড়িয়ে বেঘোরে জীবনটাই না যায়! তিনি চুপিসারে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কুঠির লোকজনকে ডেকে তিনি এক জায়গায় সমবেত করলেন। ঠিক হল, পেছনের দরজা দিয়ে যেতে হবে নদীর ঘাটে। সেখানে নৌকা রয়েছে। প্রথমে যাবে আহত লোকজন। তাদের সাথে যাবে মেয়েরা, বুড়োরা আর শিশুরা। তারপর অন্যরা। ধন-সম্পদ।

ঘাটে গিয়ে দেখা গেল, নৌকা রয়েছে গোটা কয়েকমাত্র। সিপাহীরা সবাইকে রেখে অধিকাংশ নৌকা নিয়ে পালিয়েছে। কে মানে কার সিদ্ধান্ত। সবাই চায় নিজের জীবন বাঁচাতে। হুড়মুড় করে সাহেবের দল এসে পড়ল নৌকার উপর। মুহূর্তে কুঠি সাহেব-শূন্য।

রালফ লিষ্টার নৌকায় উঠে তাকালেন কুঠির দিকে। ধন-সম্পদ সব পড়ে রইল। ওখানে জ্বলছে বিপ্লবীদের মশাল। নৌকা সরে যাচ্ছে দূরে। এখান থেকেও তিনি শুনতে পাচ্ছেন তাদের বিজয়-উল্লাস। দৃষ্টি বাপসা হয়ে এল রালফ লিষ্টারের। কুঠিবাড়িটিকে বাপসা লাগছে। এখন শুধুই শোনা যাচ্ছে পালিয়ে যাওয়া নৌকার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ।

তথ্যসূত্র

মেজবাহুল আলম, *তিতুমীর* — , ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

ত্রৈলোক্যনাথ পাল, *মেদিনীপুরের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড।

নিকুঞ্জ বিহারী গোস্বামী, 'ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সিলেটের ভূমিকা', *মাসিক সমীকরণ*, ঈদ সংখ্যা, সিলেট, ১৯৯০।

বিহারীলাল সরকার, *তিতুমীর*, সম্পা., স্বপন বসু, কলকাতা, ১৯৮১।

মহাশ্বেতা দেবী, *তিতুমীর*, কলকাতা, ১৩৯১।

মুনতাসীর মামুন, 'লিভসে সাহেবের সিলেট গমন', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঈদ সংখ্যা, ১১ এপ্রিল ১৯৭১।

উদ্ধৃতি *Oriental Miscellany: Comprising Anecdotes of an Indian life*, by the Hon. Robert Lindsay; *Narratives of the Battle of Conjerani, dc*, by the Honl. James and John Lindsay; *Journal of and imprisonment in Seringapatam*, by the Hon. Johan Lindsay; *An Adventure in China*, by Hon. Hugh Lindsay.

—, *শহীদ তিতুমীর ও দুদু মিয়া*, চট্টগ্রাম, ১৩৮৮।

মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন, *নীল বিদ্রোহের নানা কথা*, ঢাকা, ১৯৯০।

রবার্ট লিভসে, *সিলেট আমার বারো বছর*, অনু., আবদুল হামিদ মানিক, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট, ২০০২।

সত্যেন সেন, *মহাবিদ্রোহের কাহিনী*, ষষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯১।

সিরাজুল ইসলাম, সম্পা., *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০।

—, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসীর মামুন, সম্পা., *বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন*, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৬।

যোগেশচন্দ্র বসু, *মেদিনীপুরের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড।

Ashraf Siddique, (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers—Rajshahi*, 1976.

B.C. Allen, C.S., *Assam District Gazetteers, Volume II, Sylhet/Calcutta*, 1905.

Main-Ud-Din Ahmad Khan, *Titumir and His Followers: In British Indian Records (1831-1833 AD.)*, Islamic Foundation, Dhaka, 1980.

Nurul Islam Khan, (General Editor), *Bangladesh District Gazetteers—Pabna*, 1978.

S.N.H. Rizvi, (General Editor), *East Pakistan District Gazetteers—Dacca*, 1969.

অ্যাডর্ন প্রকাশনা

জুলফিকার হায়দার
বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম

জাফর আলম
বাহাদুর শাহ জাফর

মোরশেদ শফিউল হাসান
ফরাসি বিপ্লবের কথা

জুলফিকার হায়দার
টান্কাইলের রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধ

আমির হোসেন
বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ

জয়নাল হোসেন
রাজা ভাওয়াল সন্ন্যাস ও ভাওয়াল পরগনা

Shamsul Hossain *Edited*
Abdul Karim Commemoration Volum

Price : Bd. Tk. 180.00

US \$ 12

UK £ 8

Ap-278-2009



অ্যাডর্ন পাবলিকেশন
22 Segunbagicha Dhaka 100 Bangladesh



Since
1987

Shahosi Manusher Gol



* 1 0 3 8 8 0 3 *

Tk. 180.00 + Vat

ISBN 978 984 20 0073-7



9789842000737